বাবুইবাসা বোর্ডিং

প্রথম খণ্ড

(কৌতূহলোদ্দীপক কিশোর উপন্যাস)

স্বপনবুড়ো

বারুইবাসা বোর্ডিং

প্রথম খণ্ড

(কৌতূহলোদ্দীপক কিশোর উপন্যাস)

গল্পের আগের গল্প

আমরা দু'ভাই যখন খুব ছোট, সেই সময় ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে অস্থি-চর্ম সার হয়ে পড়ি। তাই স্বাস্থ্যলাভের জন্য পাবনার ভেতর ম্যাছরা নামক জায়গায় যাই। সেখানে আমাদের এক ভাইপো থাকতেন—বয়সে আমাদের চাইতে অনেক বড়। তখন তিনি রাজশাহী কলেজের ছাত্র।

সেই নদীবহুল জায়গায় আমরা একবার নৌকা করে বেড়াতে যাই। আমার সেই ভাইপো এক নদীর চরে নেমে ভারতের ম্যাপ এঁকে দেখান,—আর 'বন্দেমাতরম্' কথাটি শিখিয়ে দেন।

পরে বড় হয়ে শুনেছি,—উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে যত স্বদেশী ডাকাতি হ'ত তিনি ছিলেন তার ভাণ্ডারী। প্রথমে তার মুখেই স্বদেশী যুগের ছাত্রদের আত্মোৎসর্গের কথা শুনি। এক একটি বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ছাত্রদের অনুশীলন চলত। আমার এই ভাইপোটির বিষয়—কথা-প্রসঙ্গে আমি "স্বপনবুড়োর শৈশব" বইখানিতে উল্লেখ করেছি।

"বাবুইবাসা বোর্ডিং" আমার ছেলেবেলায় শোনা সেই সব স্বদেশী যুগের কাহিনীকে ভিত্তি করে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রচিত হয়েছে।

সেই ভুলে যাওয়া স্বদেশী যুগে ছাত্রদের যে শিক্ষা, নিষ্ঠা, দেশভক্তি ও আত্মত্যাগের কাহিনী টুক্‌রো টুক্‌রোভাবে শুনেছি—তারই থেকে প্রেরণা লাভ করে আমি "বাবুইবাসা বোর্ডিং" রচনা করেছি। ছেলেবেলার শোনা গল্প, আর আমার পরিকল্পনার কাহিনী মিলে-মিশে এক হয়ে গেছে,—যেমন নাকি পাহাড়ের সঙ্গে মেঘ মিশে একাকার হয়ে যায়।

তবু একথা বলব—সমগ্র উপন্যাসটি আমার নিজেরই পরিকল্পনা। কিশোর-জীবনে স্বদেশ সেবার আর দেশভক্তির যে প্লাবন মনে জাগে তাকে কেন্দ্র করেই এই কৌতূহলোদ্দীপক কিশোর উপন্যাসটি রূপ লাভ করেছে।

তরুণ মনে এমন একটা সময় আসে,—যখন রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দে বলা চলে—

—"এসেছে সে এক দিন—
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না মানে
না রাখে কাহারো ঋণ!
জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত-ভাবনা হীন।"

"বাবুইবাসা বোর্ডিং" কিশোর মনের সেই সব-হারাবার, সব খোয়াবার—স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত কয়েকটি আপন ভোলা দেশ সেবকের কাহিনী নিয়ে রচিত।

এই কিশোর-উপন্যাসটি যদি কিশোর মনে ক্ষণেকের জন্যেও দোলা দেয়—তবে আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

বইটি "শিশুসাথী"-তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ কালে বহু অঞ্চল থেকে উৎসাহবাণী পেয়েছি, পুস্তকাকারে প্রকাশ কালে সেই সব কাছের আর দূরের বন্ধুদের আকুল আগ্রহের কথা আমার মনে পড়েছে। সবাইকে জানাই স্বপনবুড়োর শুভেচ্ছা।

—**স্বপনবুড়ো**

বাবুইবাসা বোর্ডিং

প্রথম খণ্ড

॥ এক ॥

ইস্কুল বিল্ডিংটা একেবারে নদীর পারেই।

তাই যে কেউ নতুন ছাত্র এসে বোর্ডিং-এ ভর্তি হোক না কেন, সনাতনবাবুর ছিল সনাতন প্রশ্ন—'বেডিং-বাক্স নিয়ে ত বোর্ডিং-এ এসে উঠলে, কিন্তু সাঁতার জানো ত'? এ বোর্ডিং-এ থাকতে হলে ঠিক হাঁসের মতো সাঁতার জানা চাই।'

যে ছেলে সাঁতার জানে, সে বুক উঁচিয়ে জবাব দেয়—'জানি স্যার। সেবার আমাদের জেলার সন্তরণ-প্রতিযোগিতায়—'

—'ব্যস্, ব্যস্! আর বলতে হবে না।'...মাঝপথেই ছেলেটিকে থামিয়ে দেন সনাতনবাবু,—'আমি শুধু জানতে চাই সাঁতারটা জানা আছে কিনা! তারপর নদীর সঙ্গে মিতালি পাতালে আর সব কিছুই ধীরে ধীরে হবে। ভাবনার কিছু নেই।'

আপন মনে গড়গড়াটা টানতে থাকেন সনাতনবাবু।

সনাতনবাবুর বয়েস কত কেউ ভালো করে বলতে পারে না। বছরের পর বছর চলে যায়—এই সনাতনবাবু আদি অকৃত্রিম চিরকেলে সনাতন। তাঁর বয়েস বাড়ে কি কমে কেউ বুঝতে পারে না। সনাতনবাবু এই বোর্ডিং-এর সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট। ছেলেরা আড়ালে নতুন নামকরণ করেছে—'সুপারী-লণ্ঠন'। কেউ যদি তার মানে জানতে চায়—যে কেউ একজন এগিয়ে এসে হাত উঁচিয়ে বলে—'এই সোজা মানেটা বুঝতে পারলে না? সুপারীর মতোই তিনি শক্ত। আর অন্ধকারে লণ্ঠনের আলো ফেলে, সকলের দোষ-ত্রুটি এক মুহূর্তে বের করে দিতে পারেন। এই ত' আমাদের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট—তার মানেই 'সুপারী-লণ্ঠন'!'

সনাতনবাবুর বয়েস ঠিক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে কিসের জোরে—এ নিয়েও ছেলেদের মধ্যে গবেষণার অন্ত নেই।

শিক্‌কাবাব বলে—'অতি সোজা কথা। তোমরা রোজ রুই মাছ খাও। কিন্তু সেই রুই মাছের যে মুড়ো থাকে—সে হদিস রাখো কি কেউ?'

ট্যামটেমী ফোড়ন কাটলে—'বোর্ডিং-এর ছেলেদের মুড়ো খাবার নিয়ম নেই। কেন না, তাই নিয়ে কলহ শুরু হতে পারে।'

শিক্‌কাবাব বললে—'অতি ঠিক কথা। কিন্তু মাছের ত' মুড়ো থাকে। সেগুলো তারা জলে জমা রেখে আসে না। সেই মুড়ো আর মুড়োর ভেতরকার ঘীলু যদি প্রত্যহ পেটে যায়, তবে বয়েস বাড়বার সুযোগ পায় কি?'

শিক্‌কাবাবের সুন্দর ব্যাখ্যায় খুশী হয়ে সবাই এক বাক্যে চীৎকার করে ওঠে—'সাবাস! সাবাস!!'

বোর্ডিংটির নাম কিন্তু এখনো বলা হয় নি।

বোর্ডাররাই ওর একটি সুন্দর নামকরণ করেছে—

"বাবুইবাসা বোর্ডিং!"

সামনে অজস্র ঝাউগাছে বাবুইপাখী বাসা বেঁধেছে। আর বাবুইবাসা বলা হয়েছে এই জন্য যে ছেলেরা এ-বছর আসছে, ও-বছর চলে যাচ্ছে—কেউ এখানে স্থায়ী বাসিন্দা নয়। তাই অনেক ভেবে-চিন্তেই এই নাম দেওয়া হয়েছে। আর আনন্দের কথা—সকলেই খুশীমনে এই নামটি মেনে নিয়েছে।

বোর্ডিং-এর সামনেই এক ঝাঁক ঝাউগাছ। তার কোল ঘেঁষে লম্বা রাস্তা নদীর পাশ দিয়ে চলে গেছে একেবারে দিগন্তের দিকে। এই রাস্তার পরেই নদী। সন্ধ্যের পরে ছেলেদের জটলা বসে এখানে ওখানে, ঘাসের গালিচার ওপর কিংবা একেবারে নদীর কোল ঘেঁষে—যেখানে ছলাৎ-ছল করে নদীর জল কেবলই পারের ওপর মাথা খুঁড়ে মরছে।

পল্লী অঞ্চল, কিন্তু এই নদীই ওদের প্রাণবন্যা। বোর্ডারদের বিলাস হচ্ছে দুই বেলা এই নদীর জলে সাঁতার কাটা।

অনেকে রটিয়ে বেড়ায় এই নদীতে মাঝে মাঝে কুমীর আসে। কিন্তু দস্যিছেলের দল সে-কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনা; বলে—'অমনিতেই আমাদের গায়ে হলুদ মাখা আছে। কুমীর আমাদের কি করবে?'

শিক্‌কাবাব হাসতে হাসতে টিপ্পনী কাটে—'একবার আমার হাতের আওতায় আসুক না! একেবারে শিক্‌কাবাব করে ছেড়ে দেবো।'

নদীতে বাঁধা থাকে ছোট ছোট কতকগুলো ডিঙি আর বাচের নৌকো। তাই নিয়ে বিকেলবেলা একদল ছেলে নদীর এপার-ওপার পাড়ি জমায়। সেই সঙ্গে কণ্ঠে তাদের গান জেগে ওঠে—

"আমি ভয় করবো না—
দু' বেলা মরার আগে মরবো না ভাই মরবো না!
তরীখানি বাইতে গেলে—
মাঝে মাঝে তুফান মেলে—
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে—কান্নাকাটি করবো না!"

আকাশে তখন অস্তগামী সূর্যের সোনালী আভায় এখানে-ওখানে-ছিটানো মেঘদল নানা রঙের পোশাক পরে যেন ছেলেদের সেই গানের আসরে যোগ দিতে ধেয়ে আসে। নীড়ের পানে ফেরা পাখীর দলও যেন খানিকক্ষণ নীল আকাশে থমকে থাকে—এই জলসার সুরে সুর মেলাতে। সবার রঙে রঙ মিশিয়ে রঙীন আকাশ যে মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি করে, তারই ছায়া যেন টল্‌টলে নদীর জলে স্নান করতে নেমে আসে। ওপারের নারকেল গাছগুলো মাথা দুলিয়ে তাল দিতে থাকে। আরো কিছুক্ষণ বাদে যখন সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসে, তখন কোনো দূরের পল্লী থেকে মঙ্গল-শঙ্খের শব্দ শোনা যায়। কোনো কোনো কুটিরে জ্বলে ওঠে মাটির প্রদীপ। ছেলের দল এই সময়ে নৌকোর মুখ বোর্ডিং-এর দিকে ঘুরিয়ে নেয়। ওদের গলায় তখন নতুন গান জেগে ওঠে—

"ওরে আয়—
আমায় নিয়ে যাবি কে রে—
দিনের শেষের শেষ খেয়ায় !"

এই নৌকোভ্রমণ যেদিন বাদ পড়ে যায় সেদিন সন্ধ্যেবেলা বোর্ডিং-এর ঘরে ঘরে আলো জ্বালিয়ে ওরা পড়তে বসে বটে, কিন্তু পড়াশোনায় কারো মন লাগে না, সবাই উসখুস করতে থাকে।

বোর্ডিং-এর সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সনাতনবাবু তাই ঢালাও আদেশ দিয়েছেন—বিকেলের দিকে নৌকো করে বেড়ানো খুব ভালো। এতে শরীর আর মন দুই-ই আনন্দে থাকে। তাই পড়াশোনাতেও মন বসে।

•

সেদিন একটি নতুন ছেলে এসে হাজির হল, এই বাবুইবাসা বোর্ডিং হাউসে।

একটি অচেনা ছেলে ভর্তি হতে এলে বোর্ডারদের মধ্যে পুলকের প্রবাহ বয়ে যায়।

নয়া খোরাক কিছু মিলবে, তাই উৎসাহের আধিক্যে তারা বোকা-বোকা নতুন মানুষটিকে একেবারে সুপারী-লণ্ঠন সনাতনবাবুর কামরায় এনে হাজির করলে।

সনাতনবাবু সন্ধ্যেবেলা টেবিলের ওপর ল্যাম্পটি জ্বালিয়ে সেই দিনের কাগজটি খুলে নানা জাতীয় সংবাদ সংগ্রহে তৎপর ছিলেন, এমন সময় ছেলের দল গিয়ে সেখানে হাজির হল।

নিকেলের চশমাটা কপালের ওপর তুলে প্রথমেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন—'কি নাম ?'

মাথা চুল্‌কে, মুখ কাঁচুমাচু করে নতুন ছেলেটি জবাব দিলে—'আমার নাম গঙ্গারাম।'

ছেলেরা সবাই নাম শুনে হো-হো করে হেসে উঠলো। সনাতনবাবুও কাগজ পড়ায় বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় মনে মনে চটে গিয়েছিলেন। তাই ভুরু কুঁচকে মন্তব্য করলেন—'একেবারে ভ্যাবা গঙ্গারামের মতো যে এসে হাজির হলে, তা সাঁতার জানো ত' ?'

গঙ্গারাম এবার সত্যি হক্‌চকিয়ে গেল। বোর্ডিং-এ ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করবে, তার সঙ্গে সাঁতারের কি সম্পর্ক ?

আসল কারণটা না বুঝলেও ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিলে নতুন ছেলেটি—'আজ্ঞে না, সাঁতার ত' জানি নে—'

চোখের সামনে যেন একটা বড় বেলুন ফেটে গেল! সনাতনবাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—'হুঁ, সাঁতার জানো না! আমাকে একেবারে কৃতার্থ করেছ আর কি। তবে বেছে বেছে এই বোর্ডিং-এ নাম লেখাতে এসেছ কেন ?'

খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে রইলেন সনাতনবাবু। তারপর চীৎকার করে উঠলেন—'শিক্‌কাবাব—'

—'আজ্ঞে ?' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো শিক্‌কাবাবের শান-দেওয়া গলা থেকে।

—'কালকেই নদীতে নিয়ে ওকে সাঁতার শিখিয়ে দেবে।'

শিক্‌কাবাব ত তাই চায়। উত্তর দিলে—'আচ্ছা স্যার, কালকেই ভ্যাবা গঙ্গারামকে সাঁতার শিখিয়ে দেবো।'

গম্ভীর গলায় নতুন ছেলেটি উত্তর দিলে—'আমার নাম ভ্যাবা গঙ্গারাম নয়, শুধু গঙ্গারাম গায়েন।'

সনাতনবাবু আবার ফোঁস্ করে উঠলেন—'ওই হল—ওই হল। আগে সাঁতারটা শিখে নাও। তখন 'ভ্যাবাকে' বাতিল করে দিলেই হবে।'

সনাতনবাবু আবার খবরের কাগজটা চোখের ওপর তুলে ধরলেন। নিকেলের চশমাটাও আপনা থেকেই কপালের ওপরটা ছেড়ে চোখের ওপর নেমে এলো।

সবাই যে যার ঘরে এলো। সে-রাতে কিন্তু গঙ্গারামের চোখে আর ঘুম নেই।

এত বিপদেও মানুষে পড়ে! শিখতে এসেছে লেখাপড়া—তা বলে কিনা নদীতে গিয়ে সাঁতার কাটতে হবে! মানুষটা পাগল নাকি ?

ওর দূর-সম্পর্কের পিসেমশাই ত' তাকে বোর্ডিং-এ পৌঁছে দিয়েই চলে গেছে। পাশের গাঁয়ে নাকি কোন আত্মীয়-বাড়ি আছে। সেইখানে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালবেলা দেশে ফিরে যাবেন। এদিকে গঙ্গারামের যে গলাজল, সে খবর আর কে রাখছে ?

সারারাত ধরে গঙ্গারাম গোলমেলে সব স্বপ্ন দেখে আঁতকে উঠতে লাগল!

একবার দেখলে নদীর জল সব উথাল-পাথাল করছে, আর একটা হাঙর এসে

তার ডান পা-টা কামড়ে ধরেছে। তাকিয়ে দেখলে হাঙরের মুখটা ঠিক বোর্ডিং-এর সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট সনাতনবাবুর মুখের মতো!

আচম্‌কা ঘুমটা ভেঙে যেতে গঙ্গারাম বিছানার ওপর উঠে বসলো। দেখলো, ঘামে তার গা একেবারে ভিজে যাচ্ছে! গেঞ্জিটা খুলে ফেলে দিয়ে ক্রমাগত হাত-পাখাটা চালাতে লাগল।

খানিকক্ষণ বাদেই সে আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

আর একবার সে স্বপ্ন দেখলে, এক ঝাঁক কৈ মাছ তাকে তাড়া করেছে। এই কৈ মাছগুলো একেবারে মানুষের মতো লম্বা হয়ে গেছে।

গঙ্গারাম যত হাত-পা ছুঁড়ে পালাতে যাচ্ছে ততই সে জলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে জল ঢুকছে—তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে কৈ মাছগুলো আরো অনেকটা এগিয়ে আসছে, প্রায় তাকে ধরে ফেলেছে! আরো অবাক কাণ্ড, কৈ মাছের মুখগুলো এই বোর্ডিং-এর ছেলেদের মুখের মতো।

গঙ্গারামের হাত-পা আর কিছুতেই চলছে না। এইবার সে সত্যি ডুবে যাবে অগাধ জলে—

এমন সময় আর এক বিপত্তি!

ঝাউগাছের ডালে যে বাবুইপাখীর বাসাগুলো এতক্ষণ হাওয়ায় দুলছিল, এইবার সেগুলো বোমা হয়ে শাঁ-শাঁ করে তার দিকে ছুটে আসতে লাগল।

আতঙ্কে গঙ্গারাম দুই চোখ বন্ধ করে ফেললো! কিন্তু বোমার শব্দ আরো জোরালো হয়ে উঠলো।

মনে হল, তার পিঠের ওপর এসে বোমাগুলো সব ফেটে যাচ্ছে! আর বাঁচবার কোনো আশা নেই।

গঙ্গারাম প্রাণপণে চীৎকার করে উঠলো। কিন্তু তার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরুলো না।

হঠাৎ একটা কৈ মাছের কাঁটার ধাক্কা খেয়ে সে অনেক দূর ছিট্‌কে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখলে, সে তক্তপোষ থেকে নীচে পড়ে গেছে। প্রাণপণে নিজের বালিশটা শুধু আঁকড়ে ধরেছে।

ভাগ্যিস্ তার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বের হয় নি। নইলে গোটা বোর্ডিং-এর ছেলেরা এসে সেখানে জুটতো। লজ্জা ঢাকবার আর ঠাঁই থাকতো না।

শিক্‌কাবাব কিন্তু তার দায়িত্ব ভোলে নি। সকাল সকাল তেল মেখে, কোমরে গামছা জড়িয়ে একেবারে গঙ্গারামের ঘরে এসে হাজির।

গঙ্গারাম তখন মন দিয়ে অঙ্ক কষছে।

শিক্‌কাবাব বললে—'অঙ্ক এখন রাখো। সনাতনবাবুর হুকুম মনে নেই? আজ তোমায় সাঁতার শেখাতে হবে।'

গঙ্গারাম অত্যন্ত বিরক্তভাবে শিক্‌কাবাবের মুখের দিকে তাকালো।

রাত্তিরের সেই এলোমেলো স্বপ্নগুলো তখনো তার মগজে কিলবিল করছে।

সেই কৈ মাছের কাঁটা নিয়ে তেড়ে আসা!

গঙ্গারাম কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। আস্তে আস্তে বললে—'আজ আমার শরীরটা ভালো নেই। আজ থাক্—'

কিন্তু শিক্‌কাবাব শোনবার পাত্রই নয়। হ্যাঁচ্‌কা টানে ওকে বিছানা থেকে তুলে নিলে। উত্তর দিলে—'সে সব আপিল পরে করবে। সুপারী-লণ্ঠনের কড়া হুকুম, সাঁতার তোমায় শেখাতেই হবে। তারপর যদি শরীর খারাপ হয়, তবে আমাদের বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর স্বাস্থ্যের জন্য রয়েছে ডাক্তারবাবু। দু'টো পিল খেলে গায়ের ব্যথা আর থাকবে না!'

গঙ্গারাম মনে মনে বললে—

"পড়েছি শয়তানের হাতে,
চলে যেতে হবে সাথে॥"

গামছাটা কাঁধের ওপর ফেলবারও ফুরসৎ দিতে চায় না শিক্‌কাবাব। হাত ধরে টানতে টানতে ওকে নিয়ে হাজির করলে নদীর ধারে।

গঙ্গারামের মনে হল—রাশি রাশি কাঁটাওয়ালা মাছ লুকিয়ে আছে নদীর জলের তলায়; আমাদের তাড়া করতে কতক্ষণ? আর তা ছাড়া ঝক্‌ঝকে দাঁতওয়ালা হাঙর আছে। যে হাঙরের মুখটা ঠিক সুপারী-লণ্ঠনবাবুর মুখের মতো।

রাত্তিরের সেই বিভীষিকাময় স্বপ্ন আবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

॥ দুই ॥

শিক্‌কাবাবের হ্যাঁচ্‌কা টানে গঙ্গারাম একেবারে নদীর ঘাটে এসে হাজির হল।

হাজির ত হল। কিন্তু জলে নামতেই রাজ্যের ভয় ওর মগজে এসে বাসা বাঁধলে।

শিক্‌কাবাব আড়চোখে ওর কাণ্ড-কারখানা দেখছিল ; এইবার মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে আবৃত্তি করলে—

"জলে না নামিলে কেহ শেখে না সাঁতার—
হাঁটিতে শেখে না কেহ না খেয়ে আছাড় !"

তারপর মুখ টিপে টিপে সে হাসতে লাগল।

কবিতাটা কি গঙ্গারাম জানে না ? না কি, সে ভালোভাবে আবৃত্তি করতে পারে না ? সবই গঙ্গারামের জানা আছে। কিন্তু সে ভাবছে, মানুষ বেআক্কা এমন বেরসিক হয় কেন ? এই সুন্দর সকালবেলা, নদীর ধার,…ঝিরঝির করে দিব্যি হাওয়া বইছে। কেউ হয়ত এসে এই নদীর ধারে বসে সুন্দর গান ধরলে, শুনতে কি মধুরই না লাগবে ! তা নয়, কি না বলে—ওই নদীর জলে নেমে সাঁতার কাটতে হবে ! নদীর তলায় কি আছে কে জানে ? হাঙর থাকতে পারে, কুমীর থাকতে পারে, আরো কত কাঁটাওয়ালা মাছ থাকতে পারে ! হুট করে নামো বললেই কি নামা যায় ? তার চাইতে নদীর ধারে বসে নানারকম মজার মজার দৃশ্য দেখা কত আরামের ! ওই ত' সুন্দর একটি ডিঙি নৌকো হেলতে-দুলতে এই দিকেই আসছে। নদীর ঢেউয়ের মাথায় চেপে ছোট্টো ডিঙি-নৌকোটাও মাথা দোলাচ্ছে। ছইয়ের ভেতর থেকে একটি রাঙা টুকটুকে মুখের ছোট্ট দু'টি হরিণ-চোখ নদীর দু'ধার দেখে নিচ্ছে। নিশ্চয়ই বিয়ের কনে। শ্বশুরবাড়ী চলেছে, কত দূরে কে জানে !

হঠাৎ এ কি কাণ্ড !

একটি লঞ্চ যেন তীরবেগে ওই ডিঙি-নৌকোটার পাশ দিয়ে চলে গেল। ঢেউ উথাল-পাথাল হয়ে উঠলো।

একটা 'গেল-গেল' চীৎকার উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। সেই ডিঙি-নৌকোটা মুহূর্তের মধ্যে উল্টে গেছে ! কনে-বৌটা যে জলের মধ্যে ডুবে গেল !

চারদিকে একটা 'হায়-হায়' শব্দ শোনা গেল !

সঙ্গে সঙ্গে নদীর ধারে বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর সুপারী-লণ্ঠনবাবুর আর এক মূর্তি দেখা গেল।

তিনি কাছা-কোঁচা সামলাতে সামলাতে ক্রমাগত বাঁশী বাজিয়ে নদীর ধারের দিকে ছুটতে ছুটতে আসছেন।

এক মুহূর্তে সিনেমার দ্রুতগতি ছবির মতো দৃশ্যপটের পরিবর্তন হল। বাবুইবাসা বোর্ডিং হাউসের ছেলের দল চোখের পলক ফেলতে না-ফেলতে সাঁতারের পোশাক পরে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

কে আগে সাঁতার কেটে গিয়ে ওই ডুবন্ত ডিঙি-নৌকোর মানুষগুলোকে উদ্ধার করবে, তারই যেন একটা প্রতিযোগিতা চলছে !

গঙ্গারাম রাত্তিরে যে কৈ মাছের সাঁতার কাটার স্বপ্ন দেখেছিল, তাই যেন নতুন করে সকালবেলা জীবন্ত হয়ে উঠেছে! তর্‌তর্‌ করে জল কেটে এগিয়ে চলেছে ছেলের দল, আর তীরে দাঁড়িয়ে সুপারী-লণ্ঠনবাবু বাঁশী বাজিয়ে চলেছেন।

অবশেষে ছেলেদের প্রাণপাত পরিশ্রম সার্থক হল। শিক্‌কাবাব ত' গঙ্গারামের পাশে দাঁড়িয়ে কবিতা আবৃত্তি করছিল। সে যে কখন জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, গোটা দৃশ্যটা দেখতে গিয়ে গঙ্গারাম সেদিকে আদৌ খেয়াল করে নি।

সেই শিক্‌কাবাবই বৌটিকে বাঁচিয়েছে।

আর একটি নৌকো ওর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সবাই ধরাধরি করে সেই নৌকোর ওপর কনে-বৌটিকে তুলে দিয়েছে।

ততক্ষণে আর সব ছেলে গিয়ে নৌকোর অন্যান্য লোককে জল থেকে টেনে তুলেছে!

একটি বুড়ো নৌকোর ওপরে বসে তামাক টানছিল। সে বোধকরি কনে-বৌয়ের শ্বশুর। সেই বুড়ো অনেকটা জল খেয়েছিল। প্রাণ যাক্‌ সেও ভালো, তবু সে নাকি হাতের হুঁকোটি ছেড়ে দেবে না! ছেলেরা জোর করে সেটি ফেলে দিতে তবে বুড়োর জীবন রক্ষা হয়।

ততক্ষণে নৌকোটাকে ঘিরে ছেলের দল একেবারে ঘাটের কিনারায় এসে পৌঁছেছে। আর সুপারী-লণ্ঠনবাবু তাঁর বাঁশী বাজানো থামিয়ে দিয়ে একেবারে জলের ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন।

গঙ্গারাম শ্বাস বন্ধ করে পরম বিস্ময়ে এই সব কাণ্ড দেখছিল, আর মনে মনে বুঝতে পারছিল, কেন এখানে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সুপারী-লণ্ঠনবাবু সাঁতার জানার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

নিজেকে ভারী ছোট মনে হতে লাগল গঙ্গারামের। তাই ত'! সে যে এখানে একেবারে অকেজো মানুষ তা একটু আগেও বিন্দুমাত্র বুঝতে পারে নি!

নৌকো থেকে ঘাটে নামানো হয়েছে কনে-বৌটিকে। সুপারী-লণ্ঠনবাবু—মানে সনাতনবাবু এগিয়ে এসে ওকে একবার বসিয়ে আবার শুইয়ে দিয়ে এই ভাবে খানিকক্ষণ কসরৎ চালিয়ে ওর পেটের জল সব বের করে ফেললেন।

তারপরেই মজার কাণ্ড!

জ্ঞান ফিরেই পেয়ে বৌটি চারদিকে পাগলের মতো তাকাতে লাগল।

সনাতনবাবু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'ভয় নেই মা! ছেলেরা তোমাদের সবাইকে বাঁচিয়ে তুলেছে। এইবার চলো আমাদের বোর্ডিং-এ। একটু গরম দুধ খেলেই বেশ খানিকটা বল পাবে।'

কিন্তু কনে-বৌটি নড়বার নাম করে না, শুধু তাঁর দিকে তাকায়।

ছেড়ে ফেলে তাই এখন পরবে চলো'—

হঠাৎ ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললে কনে-বৌটি। বুকফাটা চীৎকার করে উঠলো—'আমার গয়নার বাক্স!'

ওকে অমনভাবে কাঁদতে দেখে ছেলের দল হো-হো করে হেসে উঠলো।

শিক্‌কাবাব ফোড়ন কাটলে—'হুঁ! প্রাণটাই ত' চলে যাচ্ছিল! সেই প্রাণ ফিরে পেয়েছে কিনা, তাই সকলের আগে গয়নার বাক্সের খোঁজ পড়েছে। আমরা যে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে জান্ দিয়ে দিচ্ছিলুম সেটা বুঝি কিছু নয়?'

সনাতনবাবু ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—'ওরে চুপ কর্। গয়নার বাক্স যে মেয়েদের কতখানি তা তোরা বুঝবি কি করে?'

তারপর বৌটির দিকে তাকিয়ে বললেন—'আগে তোমরা একটু সুস্থ হও। তারপর ওরা আবার খোঁজ-খবর করে দেখবে'খন।'

শিক্‌কাবাব এক অদ্ভুত ধরনের ছেলে। এক মুহূর্ত আগে যে নিজের জীবনের মায়া ছেড়ে দিয়ে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, এখন সে বৌটির গয়নার লোভ দেখে রসিকতা করতে ছাড়লে না! বললে—'সে গয়না পরে এতক্ষণ জলদেবী নদীর অতল তলে বসে মুক্তোর আয়নায় নিজের মুখ দেখছে।'

ছেলের দল এই টিপ্পনী শুনে ভারী খুশী হয়ে উঠলো। অতি পরিশ্রমের পরও তারা সবাই প্রাণখোলা হাসি হাসতে লাগল।

সবাই দল বেঁধে বোর্ডিং-এ ফেরবার সময় শিক্‌কাবাব এক সময় গঙ্গারামকে একান্তে পেয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললে—'বেমক্কা নৌকোডুবি হল বলে আজ খুব বেঁচে গেলি কিন্তু কাল তোকে কে বাঁচাবে শুনি?'

গঙ্গারাম উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলে—'আমি সাঁতার শিখবো। তুমি আমায় শিখিয়ে দাও।'

শিক্‌কাবাব ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললে—'ব্যস্ ব্যস্! এই ত' মরদের মতো কথা!'

হাতি কা দাঁত—
মরদ কা বাত্!

সেদিন গভীর রাতে গঙ্গারাম আবার স্বপ্ন দেখলে। এ আবার অন্য রকম স্বপ্ন!

গঙ্গারাম যেন বোর্ডিং থেকে বেরিয়ে নিরালা নদীর তীরে বেড়াতে এসেছে।

একটা মিঠে ঝিরঝিরে হাওয়া দেহ-মনকে দোল দিয়ে যাচ্ছে।

সন্ধ্যেবেলা।

আকাশের দিকে চোখ পড়তে দেখা গেল ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী নিজেদের বাসার দিকে ফিরে যাচ্ছে।

পশ্চিম আকাশে মেঘের বুকে রঙের খেলা। মনে হল—অদেখা বিধাতাপুরুষ অনেকগুলো রঙের বাটী নিয়ে ছবি আঁকতে বসেছিলেন। হঠাৎ হাত লেগে সেই রঙের বাটীগুলো সব উল্টে পড়ে গেছে। তাই মেঘের বুকে নানা রঙের মাখামাখি। আবার চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে রঙের সুষমা সব পাল্‌টে যাচ্ছে।

গঙ্গারাম অবাক হয়ে এই রঙের খেলা দেখছিল। আস্তে আস্তে সব রঙ মিলিয়ে গেল আকাশে। একটা বাদুড় তার কালো ডানা মেলে আকাশটাকে যেন ক্ষণকালের জন্য ঢেকে ফেললে।

আবার একটু বাদেই দেখা গেল—চাঁদ উঠেছে আকাশের গায়। সেই চাঁদের আলো খেলা করছে নদীর জলের ঢেউয়ের সঙ্গে।

অবাক হয়ে চাঁদের লুকোচুরি খেলা দেখছে গঙ্গারাম। হঠাৎ ওর চোখে পড়লো—একটি শিশু নদীর বুকে ভেসে যাচ্ছে। শিশুটি দু' হাত তুলে যেন গঙ্গারামকে ডাকলে, তাকে নদীর জল থেকে তুলে নেবার জন্য। গঙ্গারামের প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

সে একবারও চিন্তা করে দেখলে না যে, সে সাঁতার জানে না। এক মুহূর্তও ভাববার সময় নেই তার। চাঁদের আলোতে সে পরিষ্কার দেখতে পেলে—সেই শিশুটি একবার ভাসছে, আবার পরক্ষণেই ঢেউয়ের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে। কোমরের কাপড় ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে গঙ্গারাম নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। দিব্যি তর্‌তর্‌ করে ঢেউ কেটে এগিয়ে যাচ্ছিল সে।

এমন সময় হঠাৎ তার মনে হল, তাই ত'! সে ত' একটুও সাঁতার জানে না! নদীর ঢেউয়ের ওপর দিয়ে সে এগিয়ে যাচ্ছে কি করে?···এই কথা মগজে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গারামের সাঁতার দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তার হাত-পা আর ওঠে না। সে নদীর জলে তলিয়ে যেতে লাগল, প্রাণপণ চীৎকার করে উঠলো,—'কে আছ, আমাকে বাঁচাও!'

কেউ জানতে পারলে না, কেউ বুঝতে পারলে না যে, গঙ্গারাম এইভাবে নদীর তলায় তলিয়ে যাচ্ছে! ডুবতে ডুবতেও সে একবার চোখ তুলে দেখলে, শিশুটি ঢেউয়ের ধাক্কায় অনেক দূর ভেসে চলে গেছে। এখনো তার সেই কচি কচি হাতের মুঠি চকিতে চোখের সামনে ফুটে উঠছে।

একটা আচমকা ধাক্কা খেয়ে গঙ্গারামের ঘুম ভেঙে গেল। সেই সঙ্গে স্বপ্নটাও গেল ছিঁড়ে।

যাক—বাঁচা গেল!

তা'হলে সত্যি সে নদীর জলে ডুবে যাচ্ছিল না। কিন্তু নদীতে ডুবে যাওয়ার যে আতঙ্ক, তাতে সে তখনো শিউরে শিউরে উঠছিল।

কুল-কুল করে ঘাম বইছে তার সারা শরীরে। বিছানাটা ঘামে একেবারে ভিজে জব্‌জবে হয়ে গেছে।

কিন্তু সেই বাচ্চা ছেলেটা? সেও তা'হলে স্বপ্ন? গঙ্গারামের মনে হল, তেষ্টায় তার গলা কাঠ হয়ে গেছে। জলের জন্য সে চীৎকার করে উঠলো! কিন্তু গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরুলো না।

হঠাৎ চোখ কচ্‌লে তাকিয়ে দেখে, ওর বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে আছে শিক্‌কাবাব। ঘরে কোনো আলো নেই, কিন্তু জানালা দিয়ে যে ক্ষীণ চাঁদের আলো এসে ঢুকেছে—তাতেই চেনা গেল দাঁড়ানো লোকটি শিক্‌কাবাব।

নাঃ, শিক্‌কাবাব—স্বপ্ন নয়। ও ঠিক গঙ্গারামের বিছানার কাছে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে।

খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ।

একটা টিক্‌টিকি ডেকে উঠলো—টিক্—টিক্—টিক্‌! শিক্‌কাবাব যেন এরই প্রতীক্ষা করছিল।

সে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে—'এ—ই, উঠে আয় শীগ্‌গির!'

গঙ্গারামের যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। যদি বা স্বপ্নটা কোনো রকমে ভেঙেছে—আবার শেষ-রাত্তিরে শিক্‌কাবাবের এ কি অজানা খেলা? এই অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে নদীতে সাঁতার শিখতে হবে নাকি?

শিক্‌কাবাব আবার ওকে সচেতন করে দিয়ে বললে—'এই, উঠে আয় তাড়াতাড়ি, সনাতনবাবু ডাকছেন।'

একে ত' অজানা জায়গা, তার ওপর অজানা আশঙ্কায় ওর বুক এখনো কাঁপছে!

তবু সনাতনবাবুর নাম শুনে ওকে বিছানা ছেড়ে উঠতেই হল।

কোনো রকমে চোখে-মুখে জল দিয়ে একটা অবাক-করা কৌতূহল নিয়ে সে শিক্‌কাবাবের পেছন পেছন রওনা হল। শিক্‌কাবাব চলেছে আগে আগে, আর গঙ্গারাম চলেছে তার পেছন পেছন—একেবারে গাধাবোটের মতো। দু'জনের কারো মুখে কোনো কথা নেই।

একটা ছোট প্রদীপ রয়েছে শিক্‌কাবাবের হাতে, তাতে কতটুকু আলো দেয়? যত না আলো দেয়, তার চাইতে বেশী ছড়ায় ধোঁয়া। সেই কাঁপা-কাঁপা আলোর কাঁপা-কাঁপা ছায়া ফেলে দু'জনে লম্বা বারান্দা দিয়ে এগিয়ে চলে। গোটা বাবুইবাসা বোর্ডিং একেবারে নিঝুম অসাড় হয়ে পড়ে আছে। মনে হচ্ছে কোনো মায়াদানব যেন তাকে যাদুদণ্ড ছুঁইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। দূরে অন্ধকারে নদীর কলকল্লোল

শোনা যাচ্ছে, কিন্তু চোখে দেখা যাচ্ছে না কিছুই। মনে হচ্ছে, সেই মায়াদানবটা সবাইকে অজ্ঞান করে রেখে এখন নিজে মনের আনন্দে ঘুম লাগিয়েছে। দূর থেকে ভেসে আসা নদীর ফোঁস্-ফোঁসানি যেন সেই দানবটারই নাকের ডাক।

ততক্ষণে সামনের বারান্দাটা ছেড়ে ওরা পেছনের আরো নির্জন অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছুলো।

যে ঘরের সামনে গিয়ে শিক্‌কাবাব দাঁড়ালো—সেখানে কেউ থাকে বলে গঙ্গারামের কোনো ধারণা ছিল না। ওদিকটায় কেউ বড় একটা আসেও না।

এদিকে কেন নিয়ে এলো ওকে ?

গঙ্গারামের বিস্ময় আরো বেড়ে যেতে লাগল।

শিক্‌কাবাব এগিয়ে গিয়ে একটা বন্ধ ঘরের দরজায় শব্দ করলে, ঠক্—ঠক্—ঠক্ !

ঠিক সেই রকম শব্দ শোনা গেল—ঘরের ভেতর থেকে। তারপর আস্তে আস্তে ভেজানো দরজাটা একটুখানি খুলে গেল।

কোনো কথা না বলে শিক্‌কাবাব গঙ্গারামকে টেনে নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা আবার ঘরের ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

কামরাটায় ঢুকে গঙ্গারামের আর বিস্ময়ের পরিসীমা রইলো না। ঘরের মধ্যে মা কালীর মূর্তি। মূর্তির দুই পাশে দু'টি মাটির প্রদীপ জ্বলছে। সেই মূর্তির সামনে ওদের দিকে পেছন দিয়ে বসে আছেন একটি পুরোহিত—তাঁর মুখেও কোনো কথা নেই !

কিন্তু ওদের ঘরে ঢুকতে দেখে তিনি যখন মুখ ফিরালেন তখন গঙ্গারামের আরো অবাক হবার পালা !

কী আশ্চর্য ! সনাতনবাবু লাল চেলি পরে মা কালীর সামনে পুরোহিত হয়ে বসে আছেন।

গঙ্গারাম হঠাৎ নিজের গায়ে একটা চিম্‌টি কেটে বসলো। সে এখনো স্বপ্ন দেখছে না ত' ?

উঁহুঁ ! চিম্‌টিতে বেশ লাগে ! তা'হলে এ ত' আর স্বপ্ন নয় ! গঙ্গারামের চোখ দু'টি বড় হয়ে উঠলো।

আবার ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখলে—এ যেন তাদের সেই সুপারী-লণ্ঠনবাবু নয়—যেন আর কোনো মানুষ।

হ্যাঁ, সনাতনবাবু। চিরকাল যেন তিনি এই আসনে বসে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। মা কালীর সামনে তপস্যা করা ছাড়া জীবনে আর তাঁর অন্য কোনো কাজ নেই !

একটা গম্ভীর গলা শোনা গেল—"মাকে প্রণাম করো !"

গঙ্গারাম ভয়ে ভয়ে মা কালীর মূর্তির সামনে ঢিপ্ করে একটা প্রণাম ঠুকে দিল।

সনাতনবাবু আবার কথা বললেন—'আজ অমাবস্যা রাত্রি; বড় সুসময়। আজ মায়ের সামনে তোমাকে আমি দীক্ষা দেবো।'

গঙ্গারামের আবার যেন সব গুলিয়ে যায়।

সে এসেছে এই বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশুনা করবার জন্য। দীক্ষার ব্যাপার সে'ত' কিছুই বুঝতে পারছে না।

গঙ্গারাম জেগে আছে—না আবার ঘুমিয়ে পড়েছে, কিছুই ঠাহর করতে পারছে না!

সনাতনবাবুর গম্ভীর গলা আবার শোনা গেল—'আজ তোমায় দীক্ষা দিচ্ছি। তোমার কপালে পরিয়ে দিচ্ছি রক্ততিলক। দেশের সেবা ছাড়া তোমার আর কোনো ব্রত থাকবে না। তুমি আজ থেকে মায়ের নির্মাল্য হয়ে চিহ্নিত হয়ে থাকলে। আর কেউ যেন জানতে না পারে। বাইরে তুমি থাকবে হাসিখুশী বালক, খেলাধূলায় মত্ত। আনন্দের ফল্গুধারা। এই বোর্ডিং-এ প্রত্যেকটি ছেলের একটি করে হাল্কা নাম আছে। এই যেমন ধরো—শিক্কাবাব। আজ তোমার নাম হল, দরবেশ। কিন্তু অন্তরে তুমি থাকবে নির্মাল্যের মতোই পবিত্র। মায়ের ডাক যখন আসবে, তখন তুমি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে, দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই নাও লেখনী, আর এই নাও ছুরি। বুকের রক্ত দিয়ে এইখানে তোমার নাম স্বাক্ষর করো।'

গঙ্গারাম কি বুঝলে, কিছুই জানা গেল না। শুধু সম্মোহিত প্রাণীর মতো সে নিজের বুকের রক্ত দিয়ে নাম স্বাক্ষর করে দিলে।

॥ তিন ॥

তারপর দু'মাস কেটে গেছে।

গঙ্গারাম এখন বাবুইবাসা বোর্ডিংকে সত্যি ভালোবেসে ফেলেছে। এই বোর্ডিং-এর সকলের সঙ্গে তার মিতালি।

যে গঙ্গারাম একদিন জলকে ভয় পেতো, সে-ই এখন জলের পোকা হয়ে উঠেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে কি করে যে সে এত ভালো সাঁতার শিখলো সেইটেই সকলের

বিস্ময়। গঙ্গারাম যখন কোমরে শক্ত করে গামছা জড়িয়ে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন ছেলের দল তাকে 'পাকাল মাছ' বলে ডাকে।

বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ ওর এখন তিনটে নাম চলতি হয়েছে। একটা হচ্ছে বাপ-মার দেওয়া নাম—গঙ্গারাম, দ্বিতীয়টি হচ্ছে সুপারী-লণ্ঠনের দেওয়া নাম—দরবেশ, আর তৃতীয়টি ছেলেদের আদরের ডাকনাম—পাকাল মাছ। স্নানের ঘাটে প্রতিদিন যে হুল্লোড় শুরু হয়, সেখানে সে পাকাল মাছ নামেই বিশেষ পরিচিত। তরতর্ করে সে জল কেটে যখন অবলীলাক্রমে এগিয়ে যায়, তখন তাকে জলের মাছ ছাড়া অন্য কিছু ভাবা সত্যি শক্ত।

বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর সর্বত্রই একটা আলাদা আবহাওয়া। সুপারী-লণ্ঠনবাবুর মুখে একটি কথা সব সময়ই শোনা যায়—

"One thing at a time
And that done well,
Is a very good rule
As many can tell."

সেইজন্য এই বোর্ডিং-এর ছেলেরা যখন যে কাজটি করে, একেবারে সারা মন ঢেলে দিয়ে সেই কাজ সম্পাদন করে থাকে।

এখানে খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠার নিয়ম। হাত-মুখ ধুয়েই নদীর ধারে বেড়াতে হবে। অধিকাংশ ছেলেই হাফ্‌প্যাণ্ট পরে এই সময় সোজা রাস্তা ধরে ছুটতে থাকে। সনাতনবাবুও ওদের সঙ্গে ছোটেন। ফিরে এসেই সকলকে এক কাপ করে গরম দুধ খেতে হবে। এ ব্যাপারে কোনো আপত্তিই টিকবে না। ছেলেদের মধ্যে অনেকেরই দুধ সম্পর্কে প্রবল আপত্তি থাকে। কেউ কেউ বলে—'এখনও কি আমরা ছোট আছি নাকি, যে মায়ের কোলে বসে ঝিনুক-বাটি করে দুধ খাবো?'

সনাতনবাবু হাসতে হাসতে উত্তর দেন—'রোজ দুধ না খেলে সব কাজে লড়বি কি করে রে?'

যারা আপত্তি জানায় কিংবা দুধের বাটি সরিয়ে রাখে তাদের কিন্তু সমূহ বিপদ!

সনাতনবাবু নিজে গিয়ে নাক টিপে ধরে সেই ছেলেটিকে দুধ গিলিয়ে দেন। পরদিন থেকে সে একেবারে শায়েস্তা হয়ে যায়।

পড়াশোনার সময় কিন্তু কেউ কোনো কথা নয়। প্রাচীন ভারতের তপোবনে ঋষি বালকেরা একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে যেভাবে বিদ্যা অর্জন করতো—এই বাবুইবাসা বোর্ডিং হাউসে সনাতনবাবুর প্রখর দৃষ্টির সামনে ছেলের দলকে তেমনি আন্তরিকতার সঙ্গে নিজের নিজের পড়া তৈরী করতে হতো। সেইজন্য এই বোর্ডিং-এর কোনো

ছেলে পরীক্ষায় ফেল করতো না। যে ঘরের একটি ছেলে পরীক্ষার ফল খারাপ করতো, সনাতনবাবু সেই ঘরের প্রত্যেকটি ছেলেকে শাস্তি দিতেন। তাই সব ঘরে সব বোর্ডার কড়া দৃষ্টি রাখতো যাতে কারো পড়াশোনায় এতটুকু ফাঁকি না থাকে! যদি কেউ কোনো বিষয়ে কাঁচা থাকতো, তাহলে সবাই মিলে দিন-রাত পরিশ্রম করে তাকে ভালো রকম তৈরী করে দিত।

অথচ মজা এই যে, প্রতিদিন নদীতে স্নানের সময়ে ছেলের দল যেভাবে মেতে উঠতো, তা দেখলে মনে হতো না যে, এই ছাত্রদলই আবার গভীর মনোযোগের সঙ্গে লেখাপড়া করতে পারে!

ইস্কুলের কয়েক ঘণ্টা যে যার ক্লাসে ছড়িয়ে থাকতো। তারপর আবার বিকেলে বোর্ডিং-এ ফিরে জলখাবার খেয়ে নিয়ে খেলার মাঠে গিয়ে জমা হতো। সেখানে দেশী-বিদেশী সব রকম খেলারই ব্যবস্থা ছিল। কেউ খেলতো হাডু-ডু-ডু, কেউ গোল্লাছুট, কেউ দাঁড়ি বাঁধা আবার কেউ বা খেলতো গাদি।

কিন্তু সব চাইতে বেশী উত্তেজনা দেখা যেতো ফুটবল খেলায়। হেড্ করে কে গোল দিতে পারে, তাই নিয়ে প্রতিযোগিতার অন্ত ছিল না। আবার সন্ধ্যার পরে হাত-মুখ ধুয়ে, সমবেতভাবে প্রার্থনা করে যে যার পাঠ্য-পুঁথি নিয়ে পড়া তৈরী করতে বসে যেতো। ওরা দুলে দুলে পাঠ মুখস্থ করতো, আর দেয়ালে ওদের লম্বা লম্বা ছায়াগুলো দুলতো।

তারপর গভীর রাতে বোর্ডিং-এর বড় ছেলেদের সঙ্গে সুপারী-লণ্ঠনবাবুর গোপন ঘরে যে কি আলোচনা হতো, বাইরের লোকেরা তার কিছুমাত্র সন্ধান পেতো না। তবু অভিভাবকদের দল এই ভেবে খুশী ছিলেন যে, বাবুইবাসা বোর্ডিং হাউসের ছেলেরা সব সময় হুল্লোড়ে মেতে থাকে বটে, কিন্তু আসল কাজ তারা কেউই ভোলে না। পড়াশোনায় সবাই তারা চৌকস। আর বিদ্যালয়ের সবগুলো পুরস্কার তারা ঝেঁটিয়ে বোর্ডিং-এ নিয়ে আসতো—তা সে পড়া-শোনার পারিতোষিকই হোক, আর খেলাধূলার শীল্ডই হোক।

সব দিকেই বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর জয় জয়কার। আশে-পাশের গাঁয়ের ছেলেরা কখনো ভয়ে বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর টিমকে খেলায় চ্যালেঞ্জ করতে সাহস করতো না।

কিছুদিন বাদেই সনাতনবাবু এই বোর্ডিং-এর পক্ষ থেকে এক সন্তরণ-প্রতি-যোগিতার আয়োজন করে বসলেন। ঘোষণায় এই কথা পরিষ্কারভাবে জানানো হল—যে কোনো বিদ্যালয়ের ছাত্রদল এই সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারবে।

প্রতিযোগীদের দুইটি বিভাগে ভাগ করা হবে। আট বছর থেকে বার বছরের ছেলেদের একটি বিভাগ, আর তের বছর থেকে ষোল বছর পর্যন্ত আর একটি বিভাগ। এই প্রতিযোগিতার জন্য প্রচুর পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করা হবে।

এই খবর প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের ইস্কুলে বিরাট উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হল।

বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা যে যেখানে আছে এমনভাবে সাঁতার অভ্যাস করতে লাগল যে, অনেকের অসময়ে জ্বরই হয়ে গেল। এ ব্যাপারে সনাতনবাবুর প্রখর দৃষ্টি। তিনি হুঙ্কার দিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিলেন—'সাঁতারে জিততে গেলে দমই হচ্ছে আসল মূলধন। ঝোঁকের মাথায় খানিকটা বেশ এগিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু সাঁতার দিতে গিয়ে যার দম ফুরিয়ে যায়, সে প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করবে কি করে ?'

তাই প্রতিদিন প্রত্যুষে বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর ছেলেদের নদীর ধার দিয়ে দু-তিন মাইল ছুটতে হতো। তারপর বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তাদের আবার নদীর জলে সাঁতার কাটতে হতো। সনাতনবাবু সর্বদা একটি বাঁশী নিয়ে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে থাকতেন আর সবাইকার ক্ষিপ্রগতি লক্ষ্য করতেন।

এইভাবে সন্তরণ-প্রতিযোগিতার উদ্যোগ-পর্ব সমাধা হল।

যথাসময়ে সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনটি এসে গেল। ছেলের দলের মনে হল, সেদিনকার সূর্য বোধকরি তাদের মাথায় আশীর্বাদ বর্ষণ করবার জন্যই একটু আগে আগে পূব আকাশে উদিত হয়েছে।

আসল আয়োজন সনাতনবাবু ভেতরে ভেতরে সমাধা করে রেখেছেন।

সকাল থেকেই নদীর ধারে যেন মেলা বসে গেল। ছোট ছোট নৌকো প্রতি-যোগিতার সময় পাশে পাশে থাকবে—ছোটদের পাহারা দেবার জন্য। কি জানি হঠাৎ কেউ যদি জলে ডুবে যায়! অভিজ্ঞ সাঁতারুরা তখনি লাফিয়ে পড়ে তাদের জল থেকে টেনে তুলবে।

কয়েকজন ডাক্তারকে নিযুক্ত করেছেন সনাতনবাবু। তাঁরাও ছোট ছোট নৌকোতে প্রাথমিক চিকিৎসার যন্ত্রপাতি নিয়ে তৈরী হয়ে থাকবেন। কি জানি, বিপদ-আপদের কথা ত' বলা যায় না। দরকার হলেই তাঁরা কাজে লেগে পড়বেন!

যত বেলা বাড়তে লাগল, ততই নানা গ্রাম থেকে মানুষ এসে ভিড় জমাতে লাগল। অনেকে দলবল মিলে একেবারে সোজা নৌকো করেই এসেছে। নৌকোতে বসেই সাঁতারের খেলা দেখবে। তারপর সব কিছু শেষ হয়ে গেলে সেই নৌকোতে করেই নিজেদের গাঁয়ে ফিরে যাবে। এরা মাটির সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখে নি। নৌকোতেই রান্না-বাড়া চলতে থাকবে। যথাসময়ে খাওয়া-

দাওয়া চুকিয়ে ফেলবে। কিন্তু দৃষ্টি থাকবে তাদের নদীর দিকে। ছেলের দল কি ভাবে সাঁতার কাটে সেটা প্রাণ ভরে উপভোগ করতে হবে বৈ কি!

আর একদল আছে, যারা এই সাঁতারকে উপলক্ষ করে কিছু কামিয়ে নিতে চায়। তারাও মাথায় করে জিনিসপত্র নিয়ে এসে হাজির হয়েছে যথাসময়ে। নদীর ধারে তারা দোকান বসাবে।

কেউ বসিয়েছে পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান, কেউ সাজিয়ে নিয়েছে মিঠা পানি—মানে, সোডা আর লেমনেডের দোকান। পান-বিড়ি-সিগারেটের অবশ্য বিক্রি সব চাইতে বেশী। সময় কাটাতে হলে এই জিনিসগুলো অবশ্যই চাই। নৌকোতে বসে আছেন যে সব বুড়ো, তাঁদের হাতে হাতে থেলো হুঁকো সব সময়েই ধোঁয়া ছাড়ছে।

নদীর পাড়ে তেলে-ভাজার দোকানেরও অভাব নেই। গরম গরম ভাজা হচ্ছে, আর লোকের হাতে হাতে উড়ে যাচ্ছে। তেলে-ভাজার মতো মুখরোচক খাবার আর কিছু নেই। আবার তেলে-ভাজার দোকানের পাশেই গরম মুড়ির দোকান। বুড়ীরা ভেজে শেষ করতে পারছে না। আজ একদিনের মরসুমে তারা বেশ কিছু কামাই করে নিতে চায়। জিলিপির দোকানও বসেছে এখানে-ওখানে। গাঁয়ের লোকের কাছে এ পদার্থটিও উপেক্ষার নয়। তা ছাড়া বসেছে ফলের দোকান। কচি শশা, তরমুজ, ফুটি, বেল, কালোজাম—যার গাছে যা ফলেছে ঝুড়ি করে নিয়ে এসে হাজির হয়েছে। রথ দেখা আর কলা বেচা দুই-ই হবে। মনোহারী দোকানও এ সুযোগ ছাড়তে রাজী নয়। কাঁচের চুড়ি, মেয়েদের চুলের ফিতে, তরল আলতা, ঝুটো মুক্তোর মালা, আয়না, চিরুনি, স্নো, পাউডার—সব কিছুই সাজিয়ে নিয়ে বসেছে। কিছু কিছু রঙীন জামা-কাপড়ের ছিট্ও আছে বৈ কি সঙ্গে। কে কি পছন্দ করবে, আগে থেকে ত' কিছু বলা যায় না। গাঁয়ের মানুষ, চট্ করে মন ভোলে।

এই মরসুমে জেলের দলও তৎপর হয়ে উঠেছে। নদীর ধারের মানুষ, নদীকে নিয়েই যখন কাজ-কারবার—তখন ওরাই পা পেছিয়ে থাকবে কেন? তা ছাড়া বাড়ি ফেরবার মুখে মাছ সবাইকারই চাই। যারা সাঁতারে জয়লাভ করে পুরস্কার পাবে, তাদের দল ফিরে গিয়ে বিরাট ভোজ লাগাবে। কাজেই বড় বড় রুই-কাতলা চিতোল-বোয়াল চাই বৈ কি! আগে থেকে জাল ফেলে মাছ না ধরলে চাহিদা মেটানো কি চারটিখানি কথা?

বড় বড় গুড়ের হাঁড়ি নিয়ে আবার একদল বসে গেছে এক কোণে। সাঁতারের ব্যাপারে গুড় কোন্ কাজে লাগবে?

কিছুই বলা যায় না! কোনো দল সাঁতারে জিতে যদি পরমান্ন পরিবেশন করতে চায়, তবে ওই গুড়ের হাঁড়ি নিয়ে টানাটানি হবে বৈ কি!

এতক্ষণে বিচারকের দল এসে পড়েছেন। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ব্যায়াম-শিক্ষক ও সাঁতারুর দল এই সন্তরণ-প্রতিযোগিতার বিচারকার্য সমাধা করবেন।

এইবার নদীর ধারে যে দিকে তাকানো যায়, শুধু কালো কালো মাথা। কত লোকে যে গাছের ওপর উঠে বাদুড়ের মতো ঝুলছে, তার আর সীমা-সংখ্যা নেই!

দূর থেকে কিন্তু চমৎকার লাগছে দেখতে। একেবারে ছবি তুলে নেবার মতো। তবু এখনো নানা গ্রাম থেকে মানুষের মিছিল আসছে। বোর্ডিং-এর ছাদে উঠে দেখলে মনে হবে, দূর দূর অঞ্চলের মাঠ দিয়ে যেন পিঁপড়ের সারি নদীর দিকে রওনা হয়েছে।

প্রতিযোগীদের যিনি রওনা করিয়ে দেবেন, তাঁকে বলা হয় 'ষ্টার্টার'। তিনি বাঁশী নিয়ে এসে নদীর ধারে দাঁড়িয়েছেন। অনেক সময় বন্দুকের শব্দ করেও প্রতি-যোগিতা শুরু করা হয়।

প্রতিযোগীরা কেউ হাফ্‌প্যান্ট পরে, কেউ মালকোঁচা মেরে তৈরী হয়ে নিয়েছে। সারা গায়ে ভালো করে সরষের তেল মালিশ করে নিয়েছে সবাই। বড় ছেলেরা এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল।

প্রথমে ছোটদের দলের প্রতিযোগিতা শুরু হবে। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে ছাত্রদল। তার ভেতর আমাদের পাকাল মাছও দিব্যি বুক চিতিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

বেজে উঠলো বাঁশী। সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে।

মেয়েরা তীরে দাঁড়িয়ে শঙ্খধ্বনি করে উঠলো। একদল বৌ-ঝি নানা রঙের ফুল ছিটিয়ে দিলে নদীর জলে। সেগুলো ভেসে যেতে লাগল ঢেউয়ের ধাক্কায়। আবার আর একদল ছেলে নদীর জলে কাগজের নৌকো ভাসিয়ে দিয়ে মজা দেখতে লাগল। সেই কাগজের নৌকোগুলোর মধ্যে প্রতিযোগীদের নাম লেখা! তাই নিয়ে সবাইকার উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্ত নেই।

ক্ষুদে প্রতিযোগীরা এরই সঙ্গে জলের মধ্যে হাত টেনে টেনে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। কখনো তাদের মাথা দেখা যাচ্ছে, কখনো তলিয়ে যাচ্ছে জলের তলে।

প্রতিযোগীদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ডিঙি-নৌকোগুলো। ডাক্তারেরা তটস্থ হয়ে নৌকোর ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। জীবনরক্ষী-বাহিনী দলের কারো চোখের পলক পড়ে না। কোন্ মুহূর্তে নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে—তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে বৈ কি!

যেখানটায় সন্তরণের সমাপ্তি-রেখা, সেই জায়গাটা দড়ি দিয়ে ভালো করে ঘিরে রাখা আছে। আর একদল বিচারক সেইখানে গিয়ে হাজির হয়েছেন। তাঁদের হাতে কি সব খাতা-পত্র রয়েছে।

মাঝামাঝি পথ অতিক্রম করে কয়েকটি ছেলে অবসন্ন হয়ে পড়লো। আর তাদের হাত চলে না। হয়ত ওরা ডুবেই যেতো। ওদের তাড়াতাড়ি নৌকোতে তুলে নিলে জীবনরক্ষী-বাহিনী।

চূড়ান্ত উত্তেজনা শেষ হবার মুখে। কয়েকটি ছেলে টর্পেডোর মতো দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। উল্লাসধ্বনিতে পূর্ণ হয়ে গেল নদীর তীর। আবার এখানেও ধ্বনিত হয়ে উঠলো মঙ্গল-শঙ্খ।

হঠাৎ চোখের নিমেষে পাকাল মাছ সবাইকে অতিক্রম করে তীরবেগে ছুটে এসে নির্দিষ্ট দড়ি স্পর্শ করলো।

আবার জয়ধ্বনি উঠলো চারদিক থেকে। সনাতনবাবু কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি ছুটে এসে পাকাল মাছের গলায় একটি সুন্দর ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে হাসতে লাগলেন।

॥ চার ॥

সবাই বললে—'পাকাল মাছ জলে পালিয়ে যায়। কিন্তু ডাঙায় ?'

সেখানে আর ছাড়ান নেই।

পাকাল—মানে, গঙ্গারাম ভয়ে ভয়ে জবাব দেয়—'কেন ? কি হল ? আমার পালিয়ে যাবার কি দেখলে তোমরা ?'

—'পালিয়ে যাবার মতলব নয় ? এত বড় একটা যুদ্ধ জেতা। সন্তরণ-প্রতি-যোগিতায় প্রথম হওয়া, মানেই ত' একটা বিরাট যুদ্ধে জয়লাভ করা। সেই সম্মুখ-সমরে সাফল্য লাভ করে খাওয়ানোর নামগন্ধ নেই ?'

—'খাওয়ানো মানে ?'

—'খাওয়ানো মানে খ্যাঁট্। যাকে শুদ্ধ ভাষায় বলে, ভুরি-ভোজন।'

পাকাল মাছ যেমন জলে কিল্‌বিল্ করে ওঠে। তারপর ফোড়ন কাটে—"আমি এত কষ্ট করে প্রথম হয়েছি, সেজন্য তোমাদেরই উচিত আমায় খাইয়ে দেওয়া। তা নয় কিনা, একেবারে উল্টো চাপ। আমি কেন মিছিমিছি ভূত-ভোজন করাতে যাবো ?'

গঙ্গারামের এই ফোড়নে সবাই যেন তপ্ত বালিতে খৈয়ের মতো লাফাতে থাকে—

"কী! আমরা ভূত? আমাদের খাওয়ানো মানে, ভূত-ভোজন? বেশ! তুই যদি না খাওয়াস ত' আমরাই চাঁদা করে তোকে খাইয়ে দেবো।'

গঙ্গারাম যেন আনন্দে নৃত্য করতে থাকে ; বলে—'এই ত' সত্যিকারের 'মানুষের' মতো কথা! আচ্ছা, তোমরাই ভেবে দেখ,—আমি কত দিন ধরে কসরৎ করে সাঁতার শিখেছি! তারপর দিনের পর দিন অনুশীলন করে আমার গতি বাড়িয়েছি। রোজ সকালে ছুটে ছুটে দম বাড়িয়েছি। জলের সঙ্গে যুদ্ধ করে সাঁতারের কলা-কৌশল আয়ত্ত করেছি। এই সাঁতার শেখার ব্যাপারে কত জল খেয়েছি, সে সব কথা তোমরা হিসেব করে দেখেছ কেউ? আজ বেড়ালের ভাগ্যে যখন শিকে ছিঁড়েছে, তখন তোমরাই ত' ডেকে নিয়ে গিয়ে আমায় ভরপেট খাইয়ে দেবে! আমি মুক্তকণ্ঠে তোমাদের সবাইকার জয়ধ্বনি দেবো।'

—'খুব যে বক্তৃতা দিচ্ছিস্ পাকাল মাছ!' একজন দাঁড়িয়ে উঠে ওকে ধমক দেয়।

—'এই ত' সেদিন এলি এই বোর্ডিং-এ। তখন মুখ দিয়ে কথাও বেরুতো না! এরই মধ্যে তোর ডানা গজিয়েছে, একেবারে আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে উড়তে শিখেছিস্!'

পাকাল মাছের মুখে আর হাসি ধরে না! উত্তর দিলে, 'আরে এই জন্যেই তোদের উচিত চাঁদা করে আমাকে ভালো করে খাইয়ে দেওয়া।'

সকলে বললে, 'সাবাস্! সাবাস্! তাই হবে। তোর মনোবাসনাই পূর্ণ করবো আমরা। কিন্তু কি খাবি তুই? মাংস? মাছ? না—নিরামিষ?'

গঙ্গারাম শুধু একবার ভ্যাবা গঙ্গারামের মতো মুখ করে বললে, 'কোনো রান্নাতেই আমার আপত্তি নেই, শুধু দেখতে হবে ঝালটা বেশী না হয়। তা হলেই কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে যাবো।'

ছেলের দল হুল্লোড় করে ওঠে, 'আচ্ছা তোকে তাই খাওয়াবো। জলের নৌকো, আর আকাশের ঘুড়ি—এ ছাড়া যে তুই সব খাস তা কি করে জানবো?'

এমন সময় সনাতনবাবু এসে হাজির হলেন সেখানে। জিজ্ঞেস করলেন, 'খাওয়া-দাওয়ার কথা এখানে কি হচ্ছে শুনি?'

ছেলেরা উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলে, 'একটি ভূতকে ভোজন করাতে হবে।'

সনাতনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'সেজন্যে তোমাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই, বাবুইবাসা বোর্ডিং-এই 'ফিষ্টী' লাগিয়ে দিচ্ছি। একেবারে যাকে বলে—দিয়তাং ভুজ্যতাং! আনো, ঢালো আর খাও। তোমরা সব জলের পোকা হয়ে উঠছ, তাই নানা রকম মাছের রান্নাই খাওয়াবো তোমাদের।'

এই মধুর সন্দেশে ছেলের দলের মধ্যে একটা হুল্লোড় জেগে উঠলো—সেই ভালো, সেই ভালো।

সবার তরেই জমবে ভোজ,
কেই বা রাখে কাহার খোঁজ ॥

পরদিন থেকে বোর্ডিং এর ছেলেরা এক নতুন আনন্দে মেতে উঠলো।

কি কি মাছ জালে ধরা পড়বে, কোন্ মাছ দিয়ে ঝোল, কোন্ মাছ দিয়ে পাতুড়ী, কোন্ মাছ দিয়ে ঝাল-হলুদ, আর কি মাছ দিয়ে মালাইকারী তৈরী হবে ছেলে-মহলে শুধু তারই আলোচনা চললো।

সনাতনবাবু রসিক মানুষ। মাঝে মাঝে সব কিছু দিয়েই রসান দিতে লাগলেন। বললেন, 'সাঁতারের ব্যাপার বলেই কি শুধু মাছের কথা ভাবতে হবে? বড় বড় রসগোল্লার কথা ভাবো, চিনিপাতা দৈয়ের কথা চিন্তা করো, আর খাম্‌চা মেরে নেবার ক্ষীরের কথাও আন্দাজ করতে থাকো সবাই'—

পাকাল বলে, 'অমন করে বলবেন না স্যার! আমার জিবে একেবারে জল এসে যাচ্ছে!'

এমনি আনন্দের হাল্‌কা হাওয়ায় ভেসে চলেছে যখন সারা বোর্ডিং-এর ছেলের দল, তখন একদিন হঠাৎ গভীর রাত্রে সনাতনবাবু মৃদুপায়ে গঙ্গারামের ঘরে গিয়ে হাজির হলেন; চাপা গলায় ডাক দিলেন, 'দরবেশ!'

গঙ্গারাম তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে! সনাতনবাবুর চাপা গলার ডাক তার কানে পৌঁছুলো না।

পাকাল মাছ তখন স্বপ্ন দেখছে—সে যেন ক্ষীর-সমুদ্রে সাঁতার কাটছে আর এক দল কৈ মাছ আবার তাকে তাড়া করেছে। সে যতই প্রাণপণে এগুতে যাচ্ছে ততই যেন ক্ষীরের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। তাই সনাতনবাবুর গম্ভীর গলার ডাকও সে শুনতে পেলে না!

সনাতনবাবু ওর খাটের কাছে এসে আর একটু চীৎকার করে ডাকলেন, 'পাকাল মাছ!'

এইবার গঙ্গারামের ঘুম ভেঙে গেল। আচমকা স্বপ্নটা ভেঙে যেতে সে ধড়মড় করে খাটের ওপর উঠে বসলো।

—'অ্যাঁ! আপনি স্যার! এত রাত্তিরে?'...

গঙ্গারাম বুঝতে পারলো না—সে এখনো স্বপ্ন দেখছে, না জেগে উঠছে!

সনাতনবাবু তেমনি চাপা গলায় উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ আমি। ওঠো দরবেশ। তোমার ডাক পড়েছে। তোমায় আমি আগেই জানিয়ে দিয়েছিল্যম, সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে। কখন আহ্বান আসবে কেউ জানে না।'

গঙ্গারামের ঘুমের আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। বললে, 'হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে স্যার! কি আমায় করতে হবে বলুন—'

সনাতনবাবু চুপি চুপি বললেন, 'এখন আর তুমি গঙ্গারাম নও, পাকাল মাছও নও, তুমি দীক্ষা লাভ করে হয়েছো দরবেশ! দেশ-জননীর আহ্বানে এই তোমার প্রথম কাজ। তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও।'

গঙ্গারামের দু'চোখের পাতা থেকে তখন ঘুম পালিয়ে গেছে; বললে, 'গুরুদেব, আপনি আদেশ করুন কি আমায় করতে হবে। আমি প্রস্তুত। আমার মনে আর কোনো দ্বিধা নেই।'

সনাতনবাবু ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'সাবাস্! এই ত' কর্মীর মতো কথা। এইবার মন দিয়ে শোনো তোমার কাজের কথা!'

—'বলুন।'

—'একটি পুঁটলী আমি তোমার হাতে তুলে দেবো। তার ভেতর কি আছে—সে কথা জানবার জন্য যেন তোমার মনে কোনো কৌতূহল না জাগে।'

—'জাগবে না গুরুদেব!'

—'এই পুঁটলী নিয়ে তুমি নিঃশব্দে নদী সাঁতরে ওপারের খেয়াঘাটে গিয়ে উঠবে। সেই খেয়াঘাটের কাছেই একটা বিরাট বটগাছ আছে। সেই বটগাছের তলায় একটি পাগল আপাদ-মস্তক সাদা কাপড়ে ঢেকে শুয়ে থাকবে।'

—'কে সে পাগল প্রভু?'

—'কিচ্ছু জিজ্ঞেস কোরো না। আগেই বলেছি, তোমার মনে যেন কোনো কৌতূহল না জাগে।'

—'বুঝেছি প্রভু! এইবার বলুন আমায় কি করতে হবে।'

—'সেই পাগলের শিয়রে দাঁড়িয়ে তুমি শুধু তিনবার উচ্চারণ করবে—নির্মাল্য—নির্মাল্য—নির্মাল্য! অমনি দেখবে সেই পাগল উঠে বসেছে। তার মুখ দেখবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করো না। পাগলও তার মুখ সেই সাদা কাপড়ে ঢেকে রাখবে। তুমি শুধু সেই পাগলটার হাতে এই পুঁটলীটা তুলে দিয়ে আবার নিঃশব্দে চলে আসবে। আসবার সময় খেয়া নৌকোয় পার হয়ে আসবে। কিন্তু যাবার সময় সাঁতরে নদী পার হবে। সব মনে থাকবে ত?'

—'সব মনে থাকবে গুরুদেব! দিন আপনি পুঁটলী।'

—'তার আগে তুমি একটি হাফ্‌প্যান্ট পরে নাও। সুইমিং কষ্টিউম্ হলে আরো ভালো। সঙ্গে ধুতি নিতে ভুলো না। আসবার সময় সেই ধুতি পরে আসবে। এক হাতে সাঁতরে যেতে পারবে না?'

দরবেশ ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে বললে, 'পারবো, এক মিনিটের মধ্যে আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।'

পাছে ঘুম-ঘুম ভাবটা আবার ফিরে আসে, এজন্য মুখ-চোখ ভালো করে ধুয়ে

ফেললো দরবেশ। হাফ্‌প্যাণ্টটা পরে নিলে। ইচ্ছে করেই গায়ে কোনো জামা রাখলো না! সাঁতার দেবার পক্ষে সুবিধে হবে।

এইবার এগিয়ে এলেন সনাতনবাবু। দরবেশের মাথায় হাত রেখে—বিড়-বিড় করে কি যেন মন্ত্র পড়লেন। তারপর সে পুঁটলীটা ওর হাতে তুলে দিলেন।

দরবেশ বেশ বুঝতে পারলো যে, পুঁটলীটা ভারী। কিন্তু জলে নামলে এ ভার আর থাকবে না,—সে খবর সে রাখে।

সনাতনবাবুর পায়ের ধূলো নিয়ে আর একটি কথাও না বলে সে সোজা বাইরে বেরিয়ে এলো।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। আকাশে ক্ষীণ চাঁদ—অজস্র তারার মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে আছে।

দরবেশ নদীর ঘাটের দিকে দ্রুত পা চালিয়ে দিল। যেখান থেকে ওরা রোজ সাঁতার দিতে শুরু করে ঠিক সেইখানে গিয়ে সে হাজির হল।

ওপারের খেয়াঘাটের মৃদু আলো চোখে পড়লো। মাথার ওপর সে আর একবার তাকালো।

কৃষ্ণপক্ষের ঘন কালো আকাশে একটু একটু করে মেঘ জমেছে।

কিন্তু দরবেশ তাতে ভয় পাবে না। গামছা দিয়ে পুঁটলীটা ভালো করে কোমরের সঙ্গে জড়িয়ে নিলে। তাতে সাঁতার দেবার কোনো অসুবিধে হবে না।

একটু বাদেই 'জয় মা কালী' বলে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে।

সে শুধু একবার পেছন ফিরে দেখলে, গোটা বাবুইবাসা বোর্ডিং হাউসটা ঘুমের অতল তলে তলিয়ে আছে। শুধু সনাতনবাবুর ঘরে একটি মৃদু আলো জ্বলছে। ঠিক সেই সময় সনাতনবাবু জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দূরবীনের ভেতর দিয়ে মসী-কালো নদীর জলের দিকে তাকিয়েছিলেন।

বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে চলেছে দরবেশ। নদী তার পরিচিত।

এই ত' কয়েক দিন আগেই এই নদীতে সাঁতার কেটে সে সবাইকে হারিয়ে দিয়ে প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে। নদীকে তার আদৌ ভয় নেই। তার ভয় হচ্ছে মসী-কৃষ্ণ অন্ধকারকে।

এই আঁধারের ভেতর সাঁতার কাটতে গিয়ে কোনো রকমে দিক-ভ্রম না হয়!

নদীর ওপারের খেয়াঘাটে যে মৃদু দীপটি জ্বলছিল, দরবেশ তাকে ধ্রুবতারার মতো মনে করে জোরে জোরে হাত চালাতে লাগল।

সনাতনবাবু তখনো তাঁর জানালায় ঠায় দাঁড়িয়ে।

আরো দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে দরবেশ। নদীর মাঝামাঝি এসে যে উপস্থিত হয়েছে।

কিন্তু ওদিক থেকে ওটা আসছে কে ? এই অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে আড়াল করে একটি ছোট্ট লঞ্চ ধীরে ধীরে জল কেটে এগিয়ে আসছে।

দরবেশ দুই চোখ থেকে জল মুছে নিয়ে ভালো করে দেখতে চেষ্টা করলো।

হুঁ ! আর ভুল নয়। সে ঠিক বুঝতে পেরেছে !

ওটা জল-পুলিশের লঞ্চ। দরবেশ আরও সাবধান হয়। তাহলে গুরুদেব ওর হাতে এমন জিনিস তুলে দিয়েছেন—যার সন্ধান করে ফিরছে জল-পুলিশের দল !

পরাধীন ভারতে যে একদল তরুণ—জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য মনে করে বিপদ-সঙ্কুল পথে এগিয়ে চলেছে, সে খবর দরবেশ রাখে।

আর সেই পথে পা বাড়াবার জন্যই ত' সেদিন গভীর রজনীতে মা কালীর সামনে দীক্ষা দিয়েছেন গুরুদেব।

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন ! সে কিছুতেই কর্তব্যচ্যুত হবে না।

জল-পুলিশের দল কি তাকে দেখতে পেয়েছে ?

পুলিশের লঞ্চ এত আস্তে আস্তে আসছে যে, তার কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। লঞ্চ থেকে কোনো ভেঁপুও বাজছে না।

এক মুহূর্তে দরবেশ তার কর্তব্য স্থির করে ফেললে। তার পাশেই যাচ্ছিল একটি খড়-বোঝাই নৌকো।

দরবেশ দ্রুতবেগে হাত চালিয়ে সেই খড়ের নৌকোর আড়ালে আত্মগোপন করলো।

জল-পুলিশের লঞ্চ আর তাকে দেখতে পাবে না !

ওর ভাগ্যি ভালো বলতে হবে। খড়ের নৌকোটা ওপারের খেয়াঘাটের দিকেই চলেছে। এতে ওর ভালোই হল। কষ্ট করে সাঁতার কাটতে কিংবা হাত-পা চালনা করতে হল না। সে নৌকের একটা আংটা ধরে চুপচাপ নিজেকে ভাসিয়ে রাখলো। নৌকোর সঙ্গে সঙ্গেই সে এগিয়ে চলতে লাগল খেয়াঘাটের দিকে।

খড়ের নৌকো ওর সহায়, বাতাসও তার অনুকূল। বিশেষ আর কোনো কষ্টই করতে হল না তাকে।

নৌকো যখন এসে খেয়াঘাটের কাছে নোঙর করলো, তখন সে অতি সহজেই পারের দিকে উঠে গেল। পেছনে তাকিয়ে দেখলে, জল-পুলিশের লঞ্চটা মাঝ-নদীতেই কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে !

দরবেশের পা দু'টো উত্তেজনায় কেমন যেন কাঁপছিল। তবু সে এতটুকু বিশ্রাম করলেনা। নদীর ধারের কাদা ভেঙে এক রকম ছুট্ লাগল—সেই বটগাছের উদ্দেশে।

হ্যাঁ, তাই ত' ! একটা লোক আপাদ-মস্তক নিজেকে ঢেকে শুয়ে আছে !

সে মন্ত্র উচ্চারণের মতো মৃদু কণ্ঠে কইলো···নির্মাল্য—নির্মাল্য—নির্মাল্য !!!

॥ পাঁচ ॥

সঙ্গে সঙ্গে যেন মন্ত্রের মতোই কাজ হল। পা থেকে মাথা অবধি ঢাকা দেওয়া সেই পাগলটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো। তারপর ওর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল দরবেশের দিকে।

সনাতনবাবুর কথা বেশ মনে ছিল—কোনো কৌতূহল যেন মনে না জাগে।

তাই দরবেশ সেই অচেনা পাগলটার মুখের দিকে তাকাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলো না। অবশ্য চাইলেই কিছু দেখা যেতো না! কেননা পাগলটা উঠে দাঁড়িয়েও চাদর দিয়ে তার মুখ ঢেকে রেখেছিল।

দরবেশও তাড়াতাড়ি তার কাজটা শেষ করে যেতে চায়। এতক্ষণ ধরে জলে সাঁতার কেটে আর খড়ের নৌকোর সঙ্গে ভেসে এসে ওর রীতিমত কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে। কাজটা হয়ে গেলেই বোর্ডিং-এ ফিরে যেতে পারে।

তাই কোনো রকম কথা না বলে সে কোমর থেকে পুঁটলীটা খুলে নিয়ে পাগলের হাত দিয়ে দিলে। পাগল এরই জন্যে প্রতীক্ষা করছিল। পুঁটলীটা নিয়ে দ্রুতপদে দূরে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পুঁটলীটা বেশ ভারীই ছিল। ওর ভেতর কি আছে কে জানে!

কিন্তু সনাতনবাবুর আদেশ—দরবেশ সেকথা নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

সে এখন যা নিয়ে মাথা ঘামাবে—তা হচ্ছে ভিজে প্যাণ্টটা ছেড়ে ফেলে শুক্‌নো ধুতিটা পরা! শুক্‌নো ধুতিটা সে বরাবর তার মাথায় পাগড়ীর মতো বেঁধে রেখেছিল। কাজেই একটু-আধটু জলের ছিঁটে লাগা ছাড়া সেটা ভিজতে পারে নি।

বটগাছটার আড়ালে গিয়ে সে শুক্‌নো ধুতিটা পরে নিলে। তারপর ধীরে ধীরে খেয়াঘাটের দিকে রওনা হল।

এবার আর নদী সাঁতার নয়, খেয়া পার হয়েই সে বোর্ডিং-এ গিয়ে হাজির হতে পারবে।

পূব আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলে, ভোর হয়ে এসেছে—এখুনি সূর্যোদয় হবে। একটা মিষ্টি ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। সারারাত হৈ-চৈ করার পর ওর ভালোই লাগছিল।

যদিও ঘুমে চোখ ঢুলে আসছিল, তবু নদীর ধারের এই সুন্দর ভোর, এই শীতল সমীরণ, এই জবাফুলের মতো টকটকে লাল তরুণ তপনের আবির্ভাব—নতুন করে যেন তার মনে বিস্ময় জাগালো।

সে যুক্ত করে নবোদিত সূর্যকে নমস্কার করলো।

খেয়ার মাঝি তখনো খেয়া নৌকোয় গিয়ে ওঠে নি—নদীর ধারের একটি ছোট্ট খড়ো ঘরে বসে হুঁকোতে সুখটান দিচ্ছে। নৌকো ছাড়বার আগে ভালো করে একটু তামাক টেনে না নিলে দেহে মনে জোর পাবে কেন ?

ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন ওপারের যাত্রী এসে খেয়াঘাটে জড় হয়েছে। তাদের এতটুকু সবুর সইছে না। ওরা মাঝিকে ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে।

মাঝি এইবার হুঁকোতে শেষ টান দিয়ে ছোট ছেলেটার হাতে ওটা চালান করে দুর্গা-দুর্গা বলে নৌকো ছেড়ে দিলে।

সত্যি, সকালবেলাকার এই সুন্দর পরিবেশটি দরবেশকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। নদীর এই চলমান স্রোতোধারা আর তার ওপর সকালবেলার রবির কিরণ এসে খেলা করছে···অবাক হয়ে সেই দিকেই সে তাকিয়েছিল। মনে হচ্ছিল বুঝি এর তুলনা নেই।

হঠাৎ তাদের খেয়া নৌকোর পাশেই একটি ষ্টীম লঞ্চের ভোঁ শুনে ওর মধুর স্বপ্নটা যেন আচমকা ভেঙে গেল।

চেয়ে দেখলে সেই জল-পুলিশের লঞ্চ। লঞ্চের ভেতর থেকেই একজন পুলিশের লোক মাঝিকে জিজ্ঞেস করলে, 'ওগো মাঝির পো, একটি লোককে পুঁটলী নিয়ে নদী সাঁতরে পার হতে দেখেছ ?'

মাঝি ভয়ে ভয়ে জবাব দিলে, 'না দারোগা সাহেব, দেখি নি ত'! কেন, ডাকাতি-টাকাতি হয়েছে নাকি কোথায়ও ?'

পুলিশের লোক বললে, 'হয় নি। তবে হতে কতক্ষণ ? এ আবার যে-সে ডাকাত নয়, একেবারে স্বদেশী ডাকাত।'

শুনে দরবেশ চুপচাপ 'ষ্ট্যাচুর' মতো ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো ; জল-পুলিশের দিকে তাকালো না পর্যন্ত।

লঞ্চ নিয়ে পুলিশের দল চলেই যাচ্ছিল—হঠাৎ ফিরে এসে হুমকি দিলে, 'মাঝি, তোমার নৌকো থামাও। আমরা খানাতল্লাসী করবো।'

মাঝি ভয়ে ভয়ে নৌকো থামিয়ে হাত জোড় করে বললে—এ আপনাদেরই রাজত্ব হুজুর। যা খুশী তাই করুন, আমি নৌকো থামিয়ে দিয়েছি।

একটি পুলিশ লাফিয়ে নৌকোর ওপর উঠে এলো। সে সবাইকার জামা-পকেট সব খুঁজে খুঁজে দেখতে লাগল।

নৌকোর ওপর যারা ছিল অনেকেই ভয়ে কাঁপতে শুরু করে দিল। কেউ কেউ আবার পুলিশের ভয়ে ভ্যাক করে কেঁদেই ফেললো। এক বুড়ো বামুন ভিন্ গাঁয়ে যাচ্ছিলেন মেয়ের জন্যে পাত্র দেখতে। তিনি চোখ দু'টি কপালের উপর তুলে

ক্রমাগত দুর্গানাম জপ করছিলেন : বিড়-বিড় করে একবার শুধু বললেন, 'আজ না জানি কার মুখ দেখে সকালবেলা যাত্রা করেছিলাম। শেষকালে পুলিশের হাতে পড়ে হাজতবাস হবে নাকি ? ব্রাহ্মণের জাত-ধর্ম কিছুই আর রইলো না দেখছি।'

পুলিশের লোকটি রসিকতা করে টিপ্পনী কেটে বললে, 'ঠাকুর, তোমার, কানো ভয় নেই। তুমি মিছামিছি কেঁদে মরছো কেন ? চুপচাপ নিজের জায়গায় বসে থাকো।

আরো খানিকক্ষণ খানাতল্লাসী করে, নৌকোর পাটাতনের তলাটা ভালো করে দেখে নিয়ে পুলিশের লোক লঞ্চ নিয়ে দূরে চলে গেল।

এবার সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বিক্রম দেখে কে ! তিনি সতেজে দাঁড়িয়ে উঠে হুমকি দিয়ে বললেন, 'হুঁ ! বিপদ অমনি হলেই হল ! আমি সব সময় গায়ত্রী জপ করছিলাম না ? এই ব্রাহ্মণ থাকতে কারো কোনো ডর-ভয়ের কারণ নেই !'

ব্রাহ্মণের আস্ফালন দেখে নৌকোসুদ্ধ লোক হেসে গড়িয়ে পড়লো।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তখন পৈতে বের করে সবাইকে অভিশাপ দিলেন, 'উচ্ছন্ন যাও সব—উচ্ছন্ন যাও ! কোথায় আমি সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম, তা এতটুকু কৃতজ্ঞতা-বোধ নেই !'

আবার আর এক পালা হাসির শব্দ শোনা গেল।

অবশেষে নৌকো এসে ঘাটে ভিড়লো।

দরবেশ তাকিয়ে দেখলে, সনাতনবাবু এসে খেয়াঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন।

ওখান থেকে বাবুইবাসা বোর্ডিং অবশ্য বেশী দূর নয়।

নিঃশব্দে দরবেশ গিয়ে ঘাটে নামলো।

সনাতনবাবুর পেছন পেছন দরবেশ বোর্ডিং-এর দিকে রওনা হল।

পথে সনাতনবাবু কোনো কথাই জিজ্ঞেস করলেন না। এমন কি ওর মুখের দিকে পর্যন্ত তাকিয়ে দেখলেন না। তবে ওইটুকু বুঝতে পারলেন, ওর ওপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল—সে কাজ সে নির্বিঘ্নে সমাধা করেছে।

সনাতনবাবু চুপচাপ গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলেন। দরবেশও নিঃশব্দে তাঁকে অনুসরণ করলো।

এইবার সনাতনবাবু বললেন, 'দুশ্চিন্তায় সারারাত ঘুমুতে পারি নি। কোনো বিপদ হয় নি ত' পথে ?'

দরবেশ যাওয়া-আসার সব কিছু ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করলো। শুনে সনাতনবাবু খুব খুশী হলেন ; স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'যাও এইবার কিছু খেয়ে নিয়ে একটা লম্বা ঘুম লাগাও গে। আজ আর ইস্কুলে যেতে হবে না। আমি তোমার ক্লাসে খবর দিয়ে দেবো'খন।'

তারপর হঠাৎ কি ভেবে বললেন, 'দাঁড়াও এক মিনিট, কাল সারারাত জলে কেটেছে—এই ওষুধটা এক ডোজ খেয়ে নাও।

ওষুধ খেয়ে দরবেশ নিজের ঘরে এসে লম্বা ঘুম লাগাল।

বিকেলের দিকে ঘুম ভাঙতেই উঠে দেখে, তার শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। রাত্রি জাগরণের আর দীর্ঘকাল সাঁতার কাটার কোনো গ্লানি নেই।

এই ঘটনার দিন সাতেক পরের কথা। সে রাত্রে যেমন ঝড়-বৃষ্টি, তেমনি মেঘ-গর্জন।

বাবুইবাসা বোর্ডিং হাউসের বোর্ডাররা মনে করেছিল—বুঝি গোটা আকাশটাই ফুটো হয়ে তোড়ে জল পড়ছে। সারা পৃথিবীটাকে বুঝি একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। বাঁচবার আর কোনো আশা নেই!

এই দুর্যোগ মাথায় করে একটি মানুষ ছুটতে ছুটতে এসে বোর্ডিং হাউসের সদর গিয়ে দরজায় ঘন ঘন কড়া নাড়ছিল।

প্রথমে সবাই মনে করেছিল, বুঝি ঝড়ের দাপাদাপি। কিন্তু একই ভাবে যখন দীর্ঘকাল ধরে কড়া নাড়ার শব্দ সবাইকে সচকিত করে তুললো তখন একটি ছেলে দরজা খুলে দিলে।

ঝড়ের ঝাপটা ও বৃষ্টির তোড়ের সঙ্গে একটি মানুষ হুমড়ি খেয়ে ভেতরে এসে পড়লো।

সবাই শিউরে উঠে দেখলে, মানুষটি রক্তে একেবারে মাখামাখি!

ছেলেরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালে। একটি ছেলে ছুটে গিয়ে তক্ষুণি সনাতনবাবুকে ডেকে নিয়ে এলো।

সনাতনবাবু এসেই সবাইকে সরিয়ে দিলেন। ওঁর নিজের শরীরে অসীম শক্তি। তাড়াতাড়ি আহত মানুষটিকে পাঁজাকোলে করে নিজের ঘরের ভেতর সেঁধিয়ে গেলেন। ছেলেদের ডেকে বললেন, 'তোমরা যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। বোর্ডিং-এর সব আলো নিবিয়ে দাও।'

তারপর একটু থেমে খাটো গলায় বললেন, 'এই রাত্তিরে পুলিশ আসতে পারে। আমি না ডাকলে তোমরা কেউ ঘর থেকে বেরিও না।'

ছেলেরা যুদ্ধের সৈনিকের মতো যে যার ঘরের ভেতর ঢুকে, আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু মন তাদের আতঙ্কে ও উত্তেজনায় ঘন ঘন আন্দোলিত হতে থাকলো।

ঝড়ের দাপট তখনো সমভাবেই চলেছে। মনে হচ্ছে, বীর প্রভঞ্জন বুঝি গোটা বোর্ডিং হাউসটাকে দু'হাতে তুলে নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে!

সনাতনবাবুর আদেশে সবাই বিছানায় শুয়ে পড়লো বটে, কিন্তু প্রবল উত্তেজনায় তাদের কারো চোখে ঘুম আসছিল না। ওরা কেবল বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছিল। মনে হচ্ছিল, বুঝি তাদের সবাইকার শয্যাকণ্টক হয়েছে।

ইতিমধ্যে দরবেশও জেগে উঠেছিল। সে এই অশান্ত রাত্রে অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। এই দাপাদাপিতে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু সনাতনবাবু ডেকে না পাঠালে ত' সে নিজে থেকে যেতে পারে না। তাই নিজের ঘরে অসহিষ্ণু হয়ে কেবলি পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল।

এমন সময় টক্-টক্ করে তার ঘরের দরজায় একটা শব্দ হল।

দরবেশ বুঝি এরই জন্যে উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করছিল। তাই তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলে।

ওর অনুমান সত্যি।

স্বয়ং সনাতনবাবুই ওর দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে। ব্যস্তভাবে বললেন, 'সেবা করার অভ্যেস আছে? তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে একবার এসো ত' দরবেশ!'

কোন কথা না বলে সে সনাতনবাবুর পেছনে পেছনে চলে গেল।

দরবেশ সনাতনবাবুর ঘরে ঢুকে দেখলে, শিক্‌কাবাব ইতিমধ্যেই সেখানে হাজির আছে। সেই মানুষটি রক্তে মাখামাখি হয়ে একটা খাটের ওপর পড়ে আছে।

সনাতনবাবু খুব বিচলিত হয়ে পড়েছেন বলে মনে হল।

দরবেশের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'শোনো দরবেশ, তুমি আর শিক্‌কাবাব আমাকে সাহায্য করবে। এই মানুষটিকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে। ওঁর পায়ে পুলিশের গুলী লেগেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি নদী সাঁতরে পালিয়ে এসেছেন, আশ্রয়ের জন্য। বাবুইবাসা বোর্ডিং হাউসে আশ্রয় মিলবে, সে-কথা ওঁর অজানা নয়। কিন্তু শুধু আশ্রয় দিলেই ত' হবে না। পা থেকে ওই গুলী বের করে ওঁর প্রাণ বাঁচাতে হবে। তারপর ওঁর নিরাপত্তার কথাও আমাদের ভাবতে হবে। শিকারী কুকুরের মতো পুলিশ ওঁর পিছু নিয়েছে। আর এক মুহূর্তও আমাদের নষ্ট করবার উপায় নেই।

ক্ষিপ্রগতিতে সনাতনবাবু আলমারী থেকে অপারেশনের যন্ত্রপাতি বের করে ফেললেন।

তবে কি সনাতনবাবু আসলে ডাক্তার! বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্য সুপারিন্‌-টেণ্ডেণ্টের মুখোশ পরে এইখানে সজাগ প্রহারীর মতো দিন যাপন করছেন।

দরবেশের মনে এই কথাগুলো জাগলো। শিক্‌কাবাবকে দেখেও মনে হল— এই জাতীয় কাজ সে এর আগে বহুবার করেছে। সে শিক্ষিত নার্সের মতো সনাতনবাবুকে সাহায্য করতে লাগলো।

॥ এগারো ॥

জীবনদার দেহে যেন হাজার হাতীর বল। একদিকে গোবিন্দ আর একদিকে রতনকে ধরে জীবনদা দৌড়ের প্রতিযোগিতা শুরু করে দিলেন।

ওরা দু'জনেও কম যায় না। সবাইকারই ব্যায়াম করার অভ্যাস আছে। লোকালয় ছেড়ে ওরা বনের পথ ধরে তীরবেগে এগুতে লাগলো।

জঙ্গলের পথ তত সমতল, নয়, এবড়ো-খেবড়ো, উঁচু-নীচু। কোথাও-কোথাও কাঁটাগাছ। এখানে-ওখানে গাছের ডাল তাদের হাত মেলে পথ বন্ধ করে রেখেছে। সেইগুলোকে পাশ কাটিয়ে দ্রুতবেগে চলা বড় সহজ নয়!

গা ছড়ে যেতে পারে, মোটা গাছের ডালের সঙ্গে মাথার ঠোকা লাগতে পারে; কাঁটাগাছের টানে কাপড় আটকে যেতে পারে। সব দিকে দৃষ্টি রেখে, নিজেদের বাঁচিয়ে দ্রুতবেগে পথ চলতে হবে।

মাইল দু'য়েক এইভাবে চলবার পর রতন হঠাৎ বলে বসলো, 'যাই বলুন জীবনদা, বড্ড খিদে পেয়েছে কিন্তু।

জীবনদা হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠলেন; বললেন—আমরা হচ্ছি এখন ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া। আমাদের কি আর খিদে-তেষ্টা থাকতে আছে রে?

গোবিন্দ ফোড়ন কেটে মন্তব্য করলে—তা যাই কেন না বলো জীবনদা, রতন কিছু মন্দ কথা বলে নি। আহা, এমন বড় বড় মাছের পেটি! সেইগুলো পাতের ওপর ফেলে কিনা পালিয়ে আসতে হল!

রতন চোখ দু'টোকে ওপরে তুলে ধ্যানমগ্ন সাধু-সন্ন্যাসীর মতো কইলে—এই পুলিশের দল কিন্তু ভারী বেরসিক। আগে মাছগুলো খাই, তারপর পায়েসের বাটি সাবাড় করি। ততক্ষণে তোরা না হয় ধীরে-সুস্থে আয়,—গোঁফে চাড়া দে; আর না হয় পেতলে-বাঁধানো লাঠিগুলোতে তেল মালিশ কর। তা নয় কি না—এমন গুরুতর পরিস্থিতিতে—হুট্ করে চলে আসা! সত্যি বলছি জীবনদা, রস-কস-জ্ঞান যদি ওদের বিন্দুমাত্র থাকে!

গোবিন্দ বললে—আমাদের সেই পাতে ফেলে আসা মাছ-গুলো এতক্ষণ ধরে পুলিশের পেটে গেল কিনা তাই বা কে জানে!

জীবনদা আবার হো-হো করে হেসে উঠলেন। সেই প্রাণ-খোলা হাসির শব্দ শুনলে মানুষ দু'দণ্ডে দুঃখ-বেদনা সব ভুলে যায়।

জীবনদা হাসতে হাসতে জবাব দিলেন—আমার বোনটিকে তোরা এখনো *চিনিস*

নি। ও বড় দৈস্যি মেয়ে! পুলিশের পেটে যাবার আগে—সব মাছ সে খালের জলে ফেলে দেবে। প্রাণে ধরে কাউকে এক টুকরো খাওয়াতে পারবে না। তবে কি জানিস?—এতক্ষণে সব খাবার সে লুকিয়ে ফেলেছে। পাছে পুলিশ এত খাবারের আয়োজন দেখে আমাদের প্রবেশ ও প্রস্থান কিছু টের পায়—সেইজন্য বোনটি ঝট্‌পট্‌ সব শিকেয় তুলে ফেলেছে। ভারী চটপটে মেয়েটি। বিদ্যুতের মতো ওর চাল-চলন। বিয়ের আগে ত বোনটি আমাদের দলেই ছিল। কত অসাধ্য সাধন যে ও করেছে—তা ভেবে আমিই অবাক হয়ে যাই।

আরো কিছু দূর এগুবার পর জীবনদা হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন; বললেন—দেখ, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। সবাই এক সঙ্গে একদিকে যাবো না। তা'হলে ধরা পড়লে তিন জনেই জালে আটকে যাবো। আমাদের কাজ তাতে কিছুই হবে না। সব পণ্ড হবে।

রতন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে—তা'হলে কি করতে হবে বলো না! আমি একা একা আবার কোন্ দিকে ছুটবো? রাস্তাঘাট কিন্তু আমি কিছুই জানি নে।

জীবনদা ততক্ষণে একটা মোটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে পড়েছেন। দর-দর করে তাঁর গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। রতন ছেলে মানুষ, তাই সে তখনো ততটা কাহিল হয়ে পড়ে নি।

গোবিন্দ কুকুরের মতো জিব বের করে কেবলি হাঁপাচ্ছে! ওর আবার ঘামটা কম হয়।

জীবনদা বললেন—গোবিন্দ, তুই আমাদের কেন্দ্রে ফিরে যা। ওখানেই সবাইকে সাবধান হতে বলবি। কখন যে পুলিশ হামলা করে ঠিক নেই। জরুরী কাগজ-পত্র সব যেন সরিয়ে ফেলে।

ভয় পেয়ে রতন জিজ্ঞেস করলে—আর আমি? আমি আপনার সঙ্গেই থাকবো ত'?

নির্বিকার ভাবে জীবনদা জবাব দিলেন—না।

তবে? প্রশ্ন করলে রতন। তার চোখে-মুখে দারুণ উৎকণ্ঠা।

জীবনদা বললেন—রতন, শোন্, তুই এক কাজ কর। তুই সোজা চলে যা আমাদের বোনের বাড়ি। পুলিশ ব্যাটারা এতক্ষণে নিশ্চয়ই পালিয়ে গেছে। আর আমার বোনটি শুধু আতঙ্কে ঘর-বার করছে। তোকে পেলে ও অনেকটা ঠাণ্ডা হবে।

গোবিন্দ জিজ্ঞেস করলে—আর তুমি জীবনদা?

জীবনদা জবাব দিলেন—আমাকে সেই জঙ্গলে ঢুকে বিপ্লবী ভাই দু'টিকে এক্ষুণি সরিয়ে অন্য জায়গায় আশ্রয় নিতে হবে। নইলে পুলিশ যে রকম হন্যে কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাতে ওদের ধরা পড়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। সবাই মিলে ধরা পড়ার

চাইতে তিন জনে আমরা তিন দিকে ছড়িয়ে পড়ি। আমাকে আজ রাত্তিরের মধ্যে কাজ হাসিল করতেই হবে।

দুইজনের মুখে দারুণ উৎকণ্ঠা। ওরা দুইজনে জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু তুমি একা যাবে জীবনদা? পুলিশ যদি পেছন থেকে হঠাৎ তোমায় ঘেরাও করে ফেলে?

মৃদু হেসে জীবনদা বললেন—না রে! সে ভয় নেই। পুলিশের সঙ্গে আমার দেখাই হবে না। সেই জঙ্গলে যাবার একটা সোজা পথ আমার জানা আছে। ঘন বনের ভেতর দিয়ে সেই রাস্তায় এগিয়ে যাবো।

এর পরেই তিন জনের পথ তিনমুখো হলো। জীবনদা ঘন বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন! গোবিন্দ নদীর তীর ধরে উল্টো দিকে হাঁটা শুরু করে দিলে। আর রতন?

রতনের মনে তখন দারুণ উৎসাহ। সে ফিরে চললো তার পথের দিদির স্নেহ-মাখানো গোবর-নিকানো বাগান-সাজানো মনোরম বাড়িখানির দিকে।

রতন যেন এবার উড়ে চললো। তাই ত! এত আনন্দও তার মনের কোণে জমা হয়ে ছিল! সে ত মোটেই জানতে পারে নি!

শিষ দিতে দিতে আপন মনে পথ চলতে লাগলো রতন। কিছুক্ষণ বাদেই ঘন বনপথ পেরিয়ে অনেকটা ফাঁকা জায়গায় এসে হাজির হল।

রতন ভাবতে লাগলো, হঠাৎ যদি তার পিঠে দু'টি পাখা গজিয়ে যায়, তবে সে উড়ে উড়ে একেবারে পরীর মতো পথের দিদির উঠোনে গিয়ে উপস্থিত হয়। ওকে দেখে পথের দিদির তখন এক চোখে হাসি আর এক চোখে জল দেখা যাবে।

আর রতন শুধু দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসবে। কোনো কথাই সে বলবে না।

আরো কিছু দূর এগুবার পর নদীর দিকে একটা শব্দ শুনে সে থমকে দাঁড়াল।

হ্যাঁ, বিপদ সত্যি পদে পদে! একটু দূরে নদীর কিনারে একটা নৌকো থেকে নামছে একদল পুলিশ। আর তাদের সঙ্গে সেই 'মোটা কুম্ভকর্ণ।

নামতে গিয়ে কুম্ভকর্ণের আর এক বিপত্তি। এত বড় বিরাট দেহ—যেমনি ঝপাৎ করে নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে জুতো একেবারে কাদার মধ্যে বসে গিয়েছে। সে কী করুণ দৃশ্য!

রতন একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে কুম্ভকর্ণের দুর্গতি লক্ষ্য করতে লাগলো।

সেই মোটা জাঁদরেল লোকটা ক্রমাগত চীৎকার করছে আর পুলিশদের হুকুম করছে—ও রে টেনে আমায় কাদার থেকে তুলে নে! আমি যে সেঁধিয়ে গেলাম—

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশরাও তৎপর হয়ে উঠল। কর্তা গর্তে পড়েছে, যে করেই হোক তাকে বাঁচাতেই হবে।

হেঁইও জোয়ান···

এই মারো টান···

সামাল পরাণ···

উদর বাঁচান···

এই গেল জান···হাফিজ !!!

পুলিশদের গা দিয়ে দর-দর করে ঘাম ঝরতে লাগল। পুলিশের দল যত টানে—তত কুম্ভকর্ণ কাদার মধ্যে সেঁধিয়ে যায় !

এখন উপায় ? এ যে হাতীর গর্তে পড়ার অবস্থা হল !

রতন কোনো রকমে হাসি চেপে মনে মনে ভাবলে, এমন একটা রগড়ের দৃশ্য একেবারে সবাইকার চোখের আড়ালে এমন ভাবে নষ্ট হয়ে গেল !

জীবনদা থাকলে নিশ্চয়ই হো-হো করে হেসে উঠতেন।

সিনেমা কোম্পানীর ক্যামেরাম্যানরা যে কোথায় লুকিয়ে থাকে তার ঠিক নেই ! নইলে বহু টাকা খরচ করে যে দৃশ্য তুলতে হতো—তা এমন করে সবাই মিলে হেলায় হারালে !

এ দুঃখ রতনের হয়তো কোনো দিনই যাবে না !

কুম্ভকর্ণের যখন এই প্রাণ নিয়ে টানাটানি চলছিল তখন নৌকো থেকে একটি ছোকরা লাফিয়ে নেমে এলো। সবাইকে হাঁক দিয়ে বললে—এমন করে কিছুতেই হবে না। আমি একটা রশি দিচ্ছি। তাঁর একটা দিক থাক বড়বাবুর হাতে, আর একটা দিক ধরে পুলিশের দল কষে টান মারতে শুরু করুক—যেমন করে বড় বড় গাছের গুঁড়ি টেনে তোলে নদীর ধার থেকে।

ছোকরার পরামর্শ মতো সেই ব্যবস্থাই করা হল। আবার শুরু হল টানাটানি আর লড়ালড়ি !

কর্তা তখন হাঁসফাঁস করে গোদা পা তুলে তুলে পুলিশ দলের সমবেত আকর্ষণে অনেক কষ্টে কাদার রাজ্যি পেরিয়ে শুক্‌নো ডাঙ্গায় এসে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে রতন সচকিত হল।

ওরা যে দল বেঁধে এই দিকেই এগিয়ে আসছে !

রতন যেখানে লুকিয়েছিল সে জায়গাটা অনেকটা ফাঁকা।

একটা গাছকে আড়াল করেই সে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু দল বেঁধে ওরা যদি কুম্ভকর্ণ সহ এই পথেই এগিয়ে আসে, তবে আড়ালের আর কিছুই থাকবে না।

কুম্ভকর্ণটা ওকে বিলক্ষণ চেনে। তা ছাড়া লোকটা ওর ওপর যে রকম চটে আছে, তাতে ধরা পড়লে আর কোনো মতেই রক্ষা নেই। কুম্ভকর্ণটা ওকে আস্ত গিলে খেতেই চাইবে।

মুহূর্তের মধ্যে সে একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখল।

পলায়নের আর কোনো উপায় নেই। সামনে কিংবা পেছনে—যে দিকেই ছুটতে যাক না কেন, ওদের চোখে পড়ে যাবেই।

পুলিশ ব্যাটাদের হাতে আবার বন্দুক আছে। ওরা যদি রতনকে ছুটতে দেখে বেমক্কা গুলি চালিয়ে বসে তা'হলে আর রক্ষা নেই!

রতন লক্ষ্য করলে—একটু দূরেই একটা পাতকুয়া। ছুটে সেইখানে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলে—পাতকুয়াটা একেবারে শুক্‌নো। ভেতরে জলের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই।

সে ভালো করে মালকোঁচা মেরে তর-তর করে সেই শুক্‌নো পাতকুয়ার মধ্যে নেমে গেল।

ততক্ষণে পুলিশের দল নীচেকার ঢালু জমি ছেড়ে ওপরের দিকে অনেকটা উঠে এসেছে।

একটু বাদেই তাদের পায়ের জুতোর খস্‌খস্ শব্দ স্পস্ট শোনা যেতে লাগল।

ওদিকে জীবনদা একা উল্কার বেগে ছুটে চলেছেন।

যে করেই হোক বিপ্লবী দু'জনকে আজ সন্ধ্যের মধ্যে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলতেই হবে।

যে বিপদের বেড়াজাল চারিদিক থেকে টেনে আনা হচ্ছে—ওরা দু'জন তার কোনো খবরই রাখে না। ওরা দু'টিতে জানে—এই জঙ্গলের মধ্যে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদেই আছে।

জীবনদাকে যথাসময়ে পোঁছে তাদের সচেতন করে তুলতে হবে; নইলে পুলিশের হাতে দু'টি মূল্যবান জীবন একেবারে বিপন্ন হবে। প্রাণ থাকতে জীবনদা কখনই তা হতে দিতে পারেন না।

শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত' সারাদিন পেটে কিছু পড়ে নি। তবু জীবনদার মনোবল এতটুকু নষ্ট হয় নি। তিনি পাগলের মতো আবার সেই আলো-আঁধারে ঢাকা বনপথ ধরে এগিয়ে চললেন। কাঁটা গাছে লেগে পা ছিড়ে যাচ্ছে, হোঁচট খাচ্ছেন কতবার! খন্দ-খানায় পড়তে পড়তে—কোনো রকমে নিজেকে সাম্‌লে নিচ্ছেন।

তবু তিনি প্রাণপণে ছুটে চলেছেন। কারণ দু'টি বিপ্লবী ভাইএর মরণ-বাঁচন আজ তাঁর হাতে।

*   *   *   *

পুলিশের দল বহু অনুসন্ধান করে যখন সেই গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করলো, তখন খাঁচা থেকে পাখী পালিয়ে গেছে!

জীবনদা এরই মধ্যে অসাধ্য সাধন করেছেন। পুলিশ এসেছে নৌকো-পথে।

কিন্তু জীবনদা হাঁটা পথে তার বহু আগে এসে বিপ্লবী দু'জনকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন।

যে খড়ের ঘরে তারা দু'টিতে বাস করতো সেটা আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলছে।

কোনো রকমের সন্ধান—এমন কি একটু কাগজ-পত্রও আর খুঁজে পাবার কিছুমাত্র উপায় রইলো না।

ঠিক এই সময় রতন হাঁপাতে হাঁপাতে শ্রান্ত-ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত বেশে পথের দিদির উঠোনে ঢুকে হাঁক দিলে—দিদি, পায়েসের লোভেই আবার ফিরে আসতে হল। বাটির তলায় কিছু পড়ে আছে নাকি ?

দিদি ছুটে এসে অর্দ্ধ মৃত ভাইটিকে জড়িয়ে ধরে আপন মনে বললে—ভাগ্যিস্ মা মাঙ্গলচণ্ডীর নির্মাল্য তোর হাতে গুঁজে দিয়েছিলাম, তাই ত' আবার তোকে ফিরে পেলাম।

॥ বারো ॥

রতন দু'টো দিন একেবারে বেহুঁশ হয়ে বিছানায় পড়ে রইলো।

ওর শরীরের ওপর দিয়ে অনেক বেশী পরিশ্রম গেছে। তারপর অনাহারে, অনিদ্রায় এমনিতেই ছেলেটা খুব কাবু হয়েছিল।

ওর কচি মনটা কখনো আনন্দে, কখনো বেদনায় দোল খেয়েছে। তাই বুঝি ছোট মগজের ওপর সব কিছু চাপ সইতে পারে নি!

তিন দিনের দিন রতন চীৎকার করতে শুরু করলো—মাথা গেল—মাথা গেল!

পথের দিদি ভারী ভয় পেয়ে গেল, ওর শরীরের অবস্থা দেখে।

বাড়িতে কোনো ব্যাটা ছেলে নেই, হঠাৎ যদি সাঙ্ঘাতিক একটা কিছু ঘটে বসে, তা'হলে লজ্জা লুকোবার আর ঠাঁই থাকবে না।

পথের দিদি আতঙ্কিত মনে কেবলই ঘর-বার করতে লাগলো।

গ্রামে একজন প্রবীণ আর বিচক্ষণ কব্‌রেজমশাই আছেন। দিদি মনে মনে ঠিক করলে তাঁর কাছেই লোক পাঠাতে হবে।

দিদির বুড়ি শাশুড়ীরও মনে একটু স্বস্তি নেই।

তিনি কেবলই হাঁক দিচ্ছেন—অ বৌমা, এই দুধের বাছা আমার বাড়িতে এসে বেঘোরে প্রাণ দেবে? তা'হলে আমার আর পাপের সীমা থাকবে না। আমি যে চোখে আঁধার দেখছি! ছেলেটা আমার বাড়িতে থাকে না। আমি কি করি বল ত' বৌমা? ভয়ে যে আমার হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

পথের দিদি তার শাশুড়ীকে ঘরের কোণে বসিয়ে দিয়ে বললে, 'আপনি কেন মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছেন মা? আপনার ছেলে বাড়িতে নেই, আমি ত' রয়েছি। আপনি সুস্থির হয়ে দু'দণ্ড বসুন দেখি। আমি এক্ষুণি কব্‌রেজমশাইকে ডেকে আনতে লোক পাঠাচ্ছি।

পাশের বাড়ির চঞ্চল ছিপ নিয়ে ছুটে যাচ্ছিল।

দিদি ডাকলে—ও চঞ্চল, শুনে যা দেখি এদিকে।

চঞ্চল বিরক্ত হয়ে জবাব দিলে—আবার পিছু ডাকছ কেন বৌদি? দেখছ আমি মাছ ধরতে রওনা হয়েছি। হাতে আমার এতটুকু সময় নেই।

দিদি ফোড়ন দিয়ে উত্তর দিলে—হুঁ! ভারী রাজ্যি জয় করতে ছুটছে ছেলে! এতটুকু দাঁড়াবার ফুরসৎ নেই! ভালোয় ভালোয় আয় বলছি। নইলে তোর দাদা বাড়িতে ফিরে এলে এমন মার খাওয়াবো—

এ বাড়ির দাদাকে চঞ্চলের ভারী ভয়। তা ছাড়া বৌদির ফাইফরমাস খাটার জন্য দাদার কাছ থেকে নানারকম উপহারও তার লাভ হয়।

তাই মুখ গোমড়া করে চঞ্চল বৌদির পাশে এসে দাঁড়াল।

পথের দিদি রোগ-শয্যায় শায়িত রতনকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, 'ওই, দেখ তোরই বয়সী একটি ছেলে—জ্বরে বেহুঁশ হয়ে আছে।' তুই কি না কব্‌রেজ-মশাইকে ডেকে না দিয়েই মাছ ধরতে ছুটেছিস?

এইবার চঞ্চল লজ্জা পেয়ে; বললে—বাঃ রে! আমি সে-কথা জানবো কেমন করে? তারপর গলাটা খাটো করে আবদারের সুরে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা বৌদি, ও ছেলেটা তোমার কে হয়?

পথের দিদি উত্তর দিলে—আমার ছোট ভাই হয় রে! দেখবি, জ্বর ছেড়ে গেলে —তোর সাথে আলাপ করিয়ে দেবো। তোর একেবারে বন্ধু হয়ে যাবে।

চঞ্চল ছিপ হাতেই একেবারে লাফিয়ে উঠল। বললে, 'সে কথা আগে বলতে হয় বৌদি। আমি এক ছুটে কব্‌রেজমশাইকে ডেকে নিয়ে আসছি। হ্যাঁ, ভালো কথা, ওর নামটা কি বৌদি?

মুচকি হেসে পথের দিদি উত্তর দিলে—আমার ভাইয়ের নাম রতন রে, রতন।

চঞ্চল যেন নামটাকে লুফে নিলে, অ্যাঁ রতন! চমৎকার নাম ত'! আমার নামটা কিন্তু অত ভাল নয়।

পথের দিদি বললে, 'কেন রে? চঞ্চল নামটাও ত' বেশ ভালো। তুই যেমন সব সময় ছটফটে, তেমনি তোর নামটাও হয়েছে চঞ্চল।

চঞ্চল বললে—তোমার ভাই ভালো হয়ে উঠলে আমরা কিন্তু বন্ধু হবো। এক-সঙ্গে মাছ ধরতে যাবো। বুঝলে বৌদি?

পথের দিদি তখন খিল-খিল করে হেসে উঠল; তারপর বললে—অত মাছ কিন্তু আমি রান্না করে দিতে পারবো না।

রসিকতায় চঞ্চলও কম নয়। সেও কৌতুক করে উত্তর দিলে—তা বৈ কি। তখন দেখবো, আমায় লুকিয়ে নিজের ভাইটিকে রান্নাঘরের কোণে বসিয়ে রাশি রাশি মাছভাজা খাওয়াচ্ছ!

দিদি ওর কথা শুনে তেড়ে মারতে গেল—তবে রে হিংসুটে! তোকে বুঝি কখনো থালাভর্তি মাছভাজা খাওয়াই নি?

চঞ্চল হাসতে হাসতে এক ছুটে পালিয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেল—একেবারে কব্‌রেজমশাইকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছি। তাঁর সামনে ত' আর তুমি আমায় কিছু বলতে পারবে না!

তারপর একমাস রতনকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি!

একদিকে মৃত্যু-দূত, আর একদিকে পথের দিদি ও চঞ্চল।

সত্যিকারের রোগীর সেবা কাকে বলে—বৌদি আর দেওর তাই দেখিয়ে দিলে।

খাওয়া নেই, ঘুম নেই, আলস্য নেই, জগতের আর কোনো দিকে চোখ মেলে তাকানো নেই, শুধু মানুষটিকে কি ভাবে বাঁচিয়ে তোলা যাবে, সেই জন্য দু'টি অনির্বাণ দীপ-শিখা যেন রতনের শিয়রে জেগে ছিল।

মৃত্যু-দূত সেই শিখার তীব্র জ্যোতি সহ্য করতে না পেরে ভয়ে পালিয়ে গেল।

যেদিন রতন অন্ন-পথ্য করলে—তিন গাঁয়ের বৌ-ঝিরা বাড়িতে ভেঙে পড়ল।

সবাই বৌয়ের সেবার ধন্যি-ধন্যি করতে লাগল। চঞ্চল বাঁকা চোখে ফোড়ন কাটলে—সব প্রশংসাই বুঝি বৌদির একার প্রাপ্য? আমার ভাগ্যে ছিটে-ফোঁটা কিছু রইলো না?

বাড়ির প্রবীণা গৃহিণী ফোক্‌লা দাঁতে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগলেন। বললেন—হ্যাঁ, সে-কথা স্বীকার করতেই হবে। চঞ্চল ছিল বলে আমার বৌমার পরাণটা বেঁচেছে। নইলে ভাইয়ের সেবা করতে গিয়ে নিজেকেই শয্যা নিতে হতো।

সেদিন বুড়ি ট্যাঁকের টাকা খরচ করে সবাইকে মিষ্টিমুখ করালেন।

নতুন জীবন পাবার সঙ্গে সঙ্গে রতন একটি নতুন বন্ধুও লাভ করলো। সে বন্ধুটি চঞ্চল। পথের দিদিকে কেন্দ্র করে ওদের দুই বন্ধুর খুনসুটি লেগেই আছে।

কে বেশী আদর কেড়ে নিচ্ছে—তাই নিয়ে দুই বন্ধুর কপট-কলহ ! রতন আর চঞ্চল নতুন করে বাড়ি সাজাতে বসলো ।

পথের দিদি ঝুমকোলতা ভালোবাসে, তাই দুই বন্ধু গিয়ে অনেক খুঁজে পেতে কোথেকে ঝুমকোলতার চারা নিয়ে এসে বাড়ির সামনে বাঁশের ফটকে লাগিয়ে দিলে ।

পথের দিদি রসিকতা করে বলে—ওই ঝুমকোলতাটা যেন রতনের প্রাণ। বড় অসুখের পর রতনের শরীরটা যেন ধীরে ধীরে ভালো হয়ে উঠছে, ঠিক তেমনি ঝুমকোলতাটাও ফন্ ফন্ করে বেড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আর কয়েক দিন পরই ফুল ফুটবে ।

চঞ্চল ব্যস্ত হয়ে শুধোলে—আর আমার প্রাণ কিসে বৌদি ?

বৌদি চোখ টিপে উত্তর দিলে—আমার দেওরের প্রাণ রয়েছে ধানীলঙ্কা গাছে। ও ঠিক ধানীলঙ্কার মতোই ঝাল আর চঞ্চল কিনা !

চঞ্চল মুখ ভার করে উত্তর দেয়—হুঁ ! বুঝতে আর বাকি নেই আমার! নিজের ভাইটিকেই শুধু আদর করা ! আমি দাদার ভাই কিনা, তাই যেন বানের জলে ভেসে এসেছি !

রতন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে—না না, চঞ্চল, বানের জলে ভেসে আসবে কেন ? চঞ্চল শুধু বানের জলে মাছ ধরে বেড়াবে !

তিন জনে মিলে হো-হো করে হেসে উঠলো ।

সত্যি, এটা মাছেরই দেশ। নদী-নালা-খাল-বিলে পোকার মতো মাছ কিল-বিল করছে ।

একদিন দিদি বললে—হ্যাঁরে, তোরা তো দিন-রাত বন বাদাড়ে ঘুরে বেড়াস। একটা ময়না পাখী ধরতে প্যারিস নে ? ময়না কিন্তু চমৎকার কথা বলে ।

তখন দুই বন্ধু উঠে-পড়ে লাগলো—কি করে একটি ময়না ধরা যায় ।

চঞ্চলের মাথার অনেক ফন্দী-ফিকির আসে। ও চটপট একটি জাল তৈরী করে ফেললে। তাই নিয়ে দুই জনে ঘুরে বেড়াতে লাগলো—বনে-জঙ্গলে, এখানে-ওখানে ।

অবশেষে ছোলা-ক্ষেতে মিললো একটি ময়না। সবাই বললে, ছোলা খেতে এসেছিল ।

ময়না দেখে দিদি ভারী খুশী ।

রতন বাঁশ কেটে সুন্দর একটি খাঁচা তৈরী করে ফেললে। এখন ময়নাকে নিয়েই তিনজনের অর্ধেক দিন কাটে। কে আগে ওকে কথা শেখাবে. তাই নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে ।

দিদি বলে—পড়ো ময়না,—রা—ধা—কে—ষ্ট !

চঞ্চল বলে—Twinkle—twinkle—little star !

রতন শেখায়—

আমি দাঁড়ের ময়না—
খিদে আমার সয় না !!

ময়না চুপ করে বসে শুধু মাথা নাড়ে, আর কুটুস্‌-কুটুস্‌ করে ছোলা ঠুকরে খায় !

দিন আসে—দিন যায়।

আস্তে আস্তে সেই ময়না শিস্‌ দেয়—নানা রকম বোল বলতে শেখে।

পাড়ার বৌ-ঝিরা এসে ময়নাকে ঘিরে ধরে। ওর মুখের শিস্‌ শুনে সবাই হেসে কুটি-কুটি !

সেদিন রাত্তিরে যেমন ঝড়, তেমনি জল !

রতন বললে, 'পড়াশোনায় আজ আর মন লাগছে না।'

দিদি এগিয়ে এসে বললে—অনেক বিদ্যে হয়েছে। খিচুড়ি রান্না করেছি ; গরম-গরম মাছ ভাজা দিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়।

সেদিন ওরা খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে সকাল-সকাল শুয়ে পড়লো।

গভীর রাত্রে যেমন ঝড়ের মাতামাতি, তেমনি অবিশ্রাম জল পড়ার শব্দ !

দু'ই ভাই-বোন দু'ই খাটে শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করে—ঘুম আর কিছুতেই আসে না।

হঠাৎ শোনা গেল—দরজায় টক-টক শব্দ ! দু'ই জনে কান খাড়া করে শুনলে। কিন্তু কেউ কাউকে ডাকলে না।

আবার সেই টক-টক শব্দ !

পথের দিদি ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলে। সারা গা জলে ভেজা জীবনদা এসে মূর্তিমান ধূমকেতুর মতো ঘরে ঢুকলেন।

দু'ই ভাই-বোন আনন্দে আর বেদনায় চীৎকার করে উঠলো—জীবনদা, তুমি !

জীবনদা জবাব দিলেন—হ্যাঁ, আমি। ভূত নই। রতন, এক্ষুণি আমার সঙ্গে তোকে বেরুতে হবে। চটপট তৈরী হয়ে নে।

পথের দিদি যেন সহসা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো—না না, ওকে নিয়ে যেও না জীবনদা। শক্ত অসুখ থেকে ও উঠেছে।

গম্ভীর গলায় জীবনদা জবাব দিলেন—সব জানি। গেলাস-গেলাস দুধ খেয়ে এখন

ওর শরীর বেশ সবল হয়েছে। আমার চাইতেও ও এখন সুস্থ আছে—ওকে আজ আমার সঙ্গে বেরুতেই হবে!

রতন আর্তনাদ করে উঠলো।

দিদির এই প্রাণঢালা স্নেহ, এমন সাজানো-গোছানো সংসার, ওদের ঝুমকোলতায় সবে ফুল ফুটেছে, ময়নাটা খাঁচায় বসে কত কথা বলে!

রতন বললে, 'না না, আমি পথের দিদিকে ছেড়ে, ময়নাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না।'

সহসা যেন আগুনের হল্‌কা বেরিয়ে এলো জীবনদার গলা থেকে—কী বললে! ময়না?

এক ছুঠে গিয়ে জীবনদা খাঁচা খুলে ময়নাটাকে উড়িয়ে দিলেন। জানালা গলিয়ে মিশকালো আঁধারের মধ্যে ময়নাটা যে কোথায় হারিয়ে গেল—কিছু বোঝা গেল না।

জীবনদা রতনের হাতটা শক্ত করে ধরে বললেন, 'চল শীগ্‌গির আমার সঙ্গে।'

পথের দিদি করুণ কণ্ঠে শুধোলে, 'জীবনদা, এই জল-ঝড়ের মধ্যে আবার এক্ষুণি ওকে নিয়ে বেরুবে? কিছু খেয়ে যাবে না?'

জীবনদা গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন, 'ওকে তুই ভালো শিক্ষা দিস নি বোন।' তাই আজ তোর এখানে আমি জল গ্রহণ করবো না। যেদিন নিজের ভুল বুঝতে পারবি—সেইদিন আবার ফিরে এসে চেয়ে নিয়ে তোর হাতের মাছ-ভাত খাবো। জেনে রাখ বোন, ঝুমকোলতার ফুল, আর খাঁচার পোষা ময়না—বিপ্লবী ভাইদের জন্য নয়।

কখন ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেছে কেউ জানে না।

ওরা অনেকগুলো নৌকো করে নিঃশব্দে এসে পৌঁছলো এক মহাজনের বাড়ির খিড়কির ঘাটে।

বাড়িতে সানাই বাজছে। বহু আত্মীয়-স্বজন এসেছে উৎসব উপলক্ষে।

পিল-পিল করে বিপ্লবী মানুষগুলো বেরিয়ে বাড়িটাকে ঘেরাও করে ফেললো।

জীবনদাকে দেখা গেল বাড়ির চিলে-কুঠুরীর ছাদের কার্নিশে। হাতে তাঁর উদ্যত রিভলভার।

হুঙ্কার দিয়ে জীবনদা বললেন, 'কেউ এতটুকু নড়বার চেষ্টা করেছেন কি—গুলীতে মারা পড়বেন। মহাজন মশাই, লোক ঠকিয়ে সারা জীবন অনেক অর্থ জমিয়েছেন। এখন লোহার সিন্ধুকের চাবি বের করে দিতে হবে।

তারপর মেয়েদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় কইলেন, 'মায়েদের কোনো ভয়

নেই। তাঁদের সম্মান এতটুকু নষ্ট হবে না। সবাইকে আমি বলছি—নিজের নিজের গায়ের গয়না খুলে পায়ের কাছে রাখুন। আমার লোক গিয়ে সব কুড়িয়ে নেবে। কেউ তাপনদের গায়ে হাতও দেবে না।

জীবনদার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ঝন্‌ঝন্‌ করে সব সোনার গহনা হরির লুটের মতো মাটিতে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো !

বাড়ির মালিক—মহাজন পাগলের মতো চীৎকার করে উঠলেন—হাম দেখ্‌ লেঙ্গে ! দারোগা সায়েব হামারা দোস্ত হ্যায় ! এ কি মগ-কা মুল্লুক হ্যায় !

তাঁর সেই চীৎকার কান্নার মতো শোনাতে লাগলো।

॥ তেরো ॥

খাঁচা থেকে যে পাখী একবার পালিয়ে যাবার সুযোগ পায়, সে আর লোহার শেকলে পা বাড়িয়ে দিতে এগিয়ে আসে না।

মানুষও ঠিক তাই। স্নেহের শৃঙ্খল মানুষ বড় ভালোবাসে।

যার কাছ থেকে সে এতটুকু স্নেহ-মমতা, ভালোবাসা পেয়েছে, বারে বারে তারই বন্ধনে সে ধরা দিতে চায়।

এ বাঁধন বড় মধুর—বড় কামনার ধন।

রতনের মনে এই মধুর আশা বাসা বেঁধেছিল যে, জীবনদা আবার হয়ত তাকে পথের দিদির শান্তির নীড়ে পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

কিন্তু রতন বলি-বলি করেও মুখ ফুটে সে-কথা প্রকাশ করতে পারে নি।

রতনের মনের মাঝখানে একান্ত বাসনা—জীবনদাই সে-কথা আপনা থেকে বলুন তাকে। আগেকার মতো মুখে সেই জ্যোছ্‌না-ধোয়া হাসি এনে বলুন—ওকে রতনা, চল তোকে তোর পথের দিদির কাছেই পৌঁছে দিয়ে আসি। আমার মাথায় এখন কত কাজের বোঝা ! তার ওপর তোর বোঝা আর বইতে পারবো না বাপু।

কিন্তু মানুষ যা চায়, ঠিক তার উল্টোটি ঘটে বসে থাকে।

নৌকো চলেছে ফিরতি মুখে। জীবনদা বুদ্ধি করে দল-বল সবাইকে একসঙ্গে রওনা হতে দেন নি।

একদল গেছে হাঁটা পথে—এদিক-ওদিক ছড়িয়ে—গঞ্জে-হাটে-বাজারে গাঁয়ের চেনা আস্তানায়। কয়েকটি দল রওনা হয়েছে নৌকোতে। কিন্তু বিভিন্ন দিকে তারা নৌকো চালিয়ে গভীর রাতেই রওনা হয়ে গেছে।

জীবনদা রতনকে সঙ্গে নিয়ে একটি ছোট্ট নৌকোয় উঠেছেন। এবার জীবনদা সেজেছেন এক মুসলমান কৃষক আর রতনকে সাজিয়েছেন তার ছেলে। নৌকো শেষরাত্তিরের আলো-আঁধারী ক্ষীণ চাঁদের জ্যোছনায় এগিয়ে চলেছে—বোধকরি নিরুদ্দেশের পথে।

কোন্ দিক থেকে ওরা এলো—এখন কোন্ দিক পানে চলেছে—রতন কিছুই ঠাহর করতে পারে না।

ছোট্ট নৌকো দুলছে আর সেই সঙ্গে দুলছে রতনের ছোট্ট মনটা।

একটা লণ্ঠন বাঁধা রয়েছে নৌকোর ডানদিকের ছইয়ের বাঁকা বাঁশের সঙ্গে; সেটা যত না আলো দিচ্ছে—কালো-কালো ধোঁয়া ছড়াচ্ছে তার চাইতে অনেক বেশী।

ছইয়ের ফাঁক দিয়ে যেটুকু আকাশ চোখে পড়ে—রতন সেই দিক পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে—আকাশের গায়ে রাশি রাশি তারা জ্বলছে আর নিবছে। মাথার ওপরকার কালপুরুষ একদিকে হেলে পড়েছে। দু-একটি নিশাচর পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে—দূর দিগন্ত থেকে।

রতন অপলক-নেত্রে তাকিয়ে থাকে মিশকালো আঁধারের দিকে। কানে ভেসে আসে নদীর ছল্-ছল্ শব্দ। পাটাতনে মাথা রেখে শুয়ে আছে বটে, কিন্তু চোখের দু'টি পাতা থেকে ঘুম একেবারে ছুটি নিয়ে পালিয়েছে।

কখনো রতনের মনে হচ্ছে—অন্য একটি নৌকো থেকে ক্ষীণ বাঁশীর শব্দ ভেসে আসছে। চঞ্চল নদীর জল সেই সুরটাকে যেন কুলকুচো করে চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে মজা পাচ্ছে।

রাত তখন কত, সেটাও ঠিক অনুমান করা যাচ্ছে না। ভোর হতে তখনো কিছুটা বাকি আছে। নিঃশব্দে আর চারটি মানুষ কেবলি দাঁড় টেনে চলেছে। তাদের মুখে এতটুকু কথা নেই। পরণে তাদের মাঝির মতোই ময়লা ছেঁড়া কাপড়, কোমরে শক্ত করে গামছা বাঁধা।

ছপ্-ছপ্-ছপ্-ছপ শব্দ একটানা শোনা যাচ্ছে।

ওই চারজন মানুষ অন্ধকারে ঘাপটি মেরে শুধু দাঁড় টেনে চলেছে। দেখে মনে হয়, একমাত্র দাঁড় টানা ছাড়া বিশ্ব-সংসারে ওরা যেন আর কিছুই জানে না! কিন্তু রতন ভালো করেই জানে, ওরা এক একজন নামকরা বিপ্লবী, ওইভাবে আত্মগোপন করে আছে। সব রকম কাজে ওরা দক্ষ। সংসারের সুখ-শান্তি, আনন্দ আর উচ্চাকাঙ্খা বিসর্জ্জন দিয়ে একমাত্র ভারত-ভূমির মুক্তির জন্য রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দে তপস্যা করে চলেছে।

কবে এরা তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করবে, আর ভারতের স্বাধীনতা উজ্জ্বল অরুণের

মতোই পূবের আকাশকে রঙ্গীন করে তুলবে—দেশের ভাগ্য-বিধাতাই বুঝি তা বলতে পারেন!

অতটুকু ছেলে রতন—কিন্তু সে এখন অনেক কথা ভাবতে চেষ্টা করে কিন্তু একটু বাদেই ওর ভাবনার সূতো হঠাৎ একটা আচমকা হাঁক-ডাকে ছিঁড়ে গেল!

জীবনদা ততক্ষণে পাটাতনের ওপর একটা কীল মেরে বললেন, 'ওরে আবদুল, ঘুমুচ্ছিস—না জেগে আছিস?'

রতন প্রথমটা ঠিকবুঝতে পারে নি—আবদুল আবার কে?

আবার জীবনদার হুমকি শোনা গেল—কি রে আবদুল, মুখে যে বোবা-কাঠি ছুঁইয়ে বসে আছিস! কথাটা তোর কানে গেল?

ততক্ষণে রতন বুঝে নিয়েছে, নৌকোর ওপর ওর নতুন নামকরণ হয়েছে আবদুল।

বিপ্লবীদের যে প্রতি মুহূর্তে নাম পাল্‌টে যায়, সে কথা ওর ভোলা উচিত হয় নি।

তাড়াতাড়ি উঠে বসে জিজ্ঞেস করলে রতম—কি বলছেন জীবনদা?

সঙ্গে সঙ্গে জীবনদা একেবারে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন হুঁ! জীবনদা! কেন বাপজান বলতে কি হয়? নৌকোয় ওঠবার সময় এত যে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলাম, সব ভস্মে ঘী ঢালা হয়েছে দেখতে পাচ্ছি! দিদির বাড়ীতে মাছের মুড়ো আর দুধ খেয়ে খেয়ে তোর মগজে আর কিচ্ছু নেই দেখতে পাচ্ছি। দিন কয়েক আমার সঙ্গে থাক—শুক্‌নো চিড়ে-মুড়ি খেয়ে দিন কাটা, তবে তো আবার বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া লাগবে!

রতন তাকিয়ে দেখে—জীবনদা ওর দিকে চেয়ে মিটি-মিটি হাসছেন!

তাই তো! সব কিছু গুলিয়ে গেল নাকি রতনের? সে তো এখন মুসলমান চাষীর ছেলে। যাকে সে জীবনদা বলে ডাকছে, তারই ছেলে সেজেছে সে। এখন 'বাপজান' বলে না ডাকলে, সব কিছু ওলট-পালট হয়ে যাবে! তাই মাথাটাকে গুড়ের কলসীর মতো ভালো করে একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কি বলছ বাপজান?

ওর বাপজান হো-হো করে হেসে উঠলো। বললে—তবু ভাগ্যি যে, আমার পোলার চ্যাতন হয়েছে! গলাটা যে কাঠ হয়ে গেল রে আবদুল! ভালো করে এক ছিলিম মিঠে-কড়া তামাক সাজ তো দেখি! দু'টো সুখ-টান দিয়ে একটু আমেজ করে নেই।

আবদুল হুঁকোটা টেনে নিয়ে তামাক সাজতে বসলো!

বেশ করে তামাক সেজে টিকে ধরিয়ে ফুঁ দিয়ে তাকে টানবার মতো তৈরী করে

আবদুল বাপজানের হাতে হুঁকোটা তুলে দিয়ে—কি যেন বলবার আশায় তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

আবদুলের বাপজানের তখন অন্য দিকে তাকাবার বিন্দুমাত্র ফুরসৎ নেই। হুঁকোটা হাতে নিয়ে ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক টেনে চলছে তো টেনেই চলেছে। মাঝে মাঝে মাথাটা একটু নাড়ছে তৃপ্তির আনন্দে।

এইবার মনে একটু সাহস যোগালো আবদুলের। আরো একটু এগিয়ে এসে তারপর জিব দিয়ে ঠোঁট দু'টোকে একটু ভিজিয়ে নিয়ে শুধোলে,আচ্ছা বাপজান, এখন কোথায় চলেছি আমরা ? আমি কি আর দিদির বাড়ি ফিরে যাবো না ?

বাপজান সঙ্গে সঙ্গে হুঁকোটা নামিয়ে নিয়ে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো ; বললে —হুঁ ! বেশ বুঝতে পারছি যে, দিদির বাড়ির খাওয়া-দাওয়ায় শরীরে বেশ চেকনাই হয়েছে। জিবে স্বাদ লেগেছে—তাও মালুম দিচ্ছে আমার। তবু বলি আবদুল, ওখানে এখন তোমার যাওয়া হবে না।

তাই তো ! দিদির বাড়ি যাওয়া এখন হবে না ! তা'হলে কোথায় চলেছে এখন আবদুল ?

আবদুলের দু'চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইলো। কিন্তু কাউকে তো সেই চোখের জল দেখানো চলবে না। সে ভারী লজ্জার বিষয়।

ভাগ্যিস নৌকোর ভেতরটা বেশ অন্ধকার। আলোর চাইতে ধোঁয়া বেশী। হাতের চেটো দিয়ে আবদুল উদগত অশ্রুকে আটকে দিলে ; তারপর ভয়ে ভয়ে আবার বাপজানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, কিন্তু কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস পেল না।

বাপজান আড়চোখে ওর মুখের অবস্থা দেখে হো-হো করে হেসে উঠলো ; বললে —অমনি আমার পোলার মুখ ভার হল।

একটু বাদে আবদুলকে কাছে টেনে নিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বাপজান বললে—ওরে বোকা ছেলে, দিদির বাড়িতেই কি তোর দিন কাটবে ? বাবুইবাসা বোর্ডিংকে কি তুই একেবারেই ভুলে গেলি ?

বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর নাম শুনে এক মুহূর্তে আবদুল যেন একেবারে রতন হয়ে গেল।

হ্যাঁ, সত্যি কথাই তো !

বাবুইবাসা বোর্ডিংকে সে যেন একেবারে ভুলেই গিয়েছিল। সেখানকার ছেলের দলের মধুর সাহচর্য্য, সেখানকার নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতের টানে অবিরাম সাঁতার কাটা, সেখানকার নদীর ধারে ঝাউগাছের ছায়ায় শীতল সোজা একটানা

আনন্দের পথ। সেখানকার পাখী-ডাকা রঙীন সকাল, আর হলদে বিকেল—সব একে একে যেন ওর চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। আর সব চাইতে আশ্চর্য মানুষ হচ্ছেন সনাতনবাবু! এমনি দেখতে দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ, কিন্তু কাজের সময় এলে সেই ঢিলে-ঢালা আমুদে লোকটি এক মুহূর্তে যেন লোহার মতো শক্ত হয়ে যান। তখন আর তাঁকে টলানো বা গলানো যায় না!

সেই বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ তাকে এতদিন পর ফিরে যেতে হবে?

সত্যি, আনন্দে যেন তার নাচতে ইচ্ছে হচ্ছিল। সেই সনাতনবাবুর পায়ের ধূলো সে এতদিন বাদে নিতে পারবে! তাঁর একান্ত কাছে বসে—বোর্ডিং-এর এত দিনকার জমা গল্পগুলো ঝুড়ি ঝেড়ে যোগাড় করতে পারবে!

কি করে এতদিন সে সনাতনবাবুকে ভুলে ছিল? এর মধ্যে একবারও তো সেই সদাশিব মানুষটির কথা তার মনে হয় নি!

সনাতনবাবু কুশলে আছেন তো?

জীবনদা বোধকরি রতনের মনের কথাগুলো মন দিয়ে পড়ছিলেন।

তিনি এইবার তার মাথায় হাত রেখে, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ক্ষোভের সঙ্গে বললেন—না রে, আমাদের সনাতনদার শরীর ভালো নেই। ওঁকে ভালো করে সেবা করার মানুষও নেই। আর সেই জন্যই তো তোকে নিয়ে যাচ্ছি সোজা তাঁর কাছে আমার মাথায় এখন হাজার কাজের বোঝা। আমি তো ওখানে থাকতে পারবো না। তোকে পৌঁছে দিয়েই আমায় আর এক পথে পালাতে হবে।

খানিকটা চুপ করে রইলেন জীবনদা।

তারপর জীবনদা আপন মনেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন—

"যে শুনেছে কানে—তাঁহার আহ্বান-গীত
ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট-আবর্ত মাঝে—
দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন—
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি॥"

একটু চুপ করে থেকে জীবনদা বললেন,না রে, সনাতনদা ভালো নেই। একটা দারুণ শক্ত কাজ সমাধা করতে গিয়ে তিনি সাজ্ঘাতিকভাবে আহত হয়েছেন। কিন্তু জানিস তো ভাই, বিপ্লবীদের হাসপাতালে যাওয়া চলে না। সেখানে হাজারো প্রশ্ন, শতেক সন্দেহ! তাই সবাইকার আড়ালে সেবা করে তাঁকে ভালো করে তুলতে হবে। আর সে ভার আমি তোর হাতেই দিতে চাই।

এইবার লজ্জা পেলে রতন। সে শুধু নিজের সুখের উদ্দেশ্যে দিদির বাড়ির নিশ্চিন্ত আরামের জন্য আঁকু-পাঁকু করছিল। কিন্তু যাঁর রোগশয্যার পাশে তার উপস্থিত

থাকার একান্তভাবে প্রয়োজন তাঁর কথাই সে ভুলে বসেছিল! সনাতনবাবুকে ভুলে থাকা কি তার উচিত হয়েছে? কষাঘাতে কষাঘাতে সে নিজের মনকে সচেতন করে তুললো।

না—না—এখন আর কোথায়ও নয়। সনাতনবাবুর রোগশয্যার পাশেই তার স্থান। রতন মনে মনে আবৃত্তি করলে জীবনদার শেখানো কবিতা—

"তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলাম শুধু লজ্জা—
এবার সকল অঙ্গ ঘেরি
পরাও রণ-সজ্জা॥"

নৌকোটি ঠিকমত চলতে পারছে না?

রতনের মনে হলো, ওরা যেন অনেকক্ষণ থেকে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

আরো দাঁড় ফেলতে পারে না বিপ্লবী ভাইরা? শত দাঁড়—সহস্র দাঁড়?

পক্ষিরাজ ঘোড়ার বেগে এই মন-পবনের নৌকো উড়ে যাবে পথের সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে?

সূর্যোদয়ের আগেই এরা গিয়ে পৌঁছুবে সেই বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ—নদীর জলের আরশিতে যার ছায়া ভাসে দিনরাত। নৌকো থেকে ছুটে নেমে তর্‌তর্‌ করে ওপরে উঠে—ঝাউগাছের পথটা পেরিয়ে বোর্ডিং-এর ভেতর দ্রুত পা চালিয়ে দেবে!

পৌঁছুবে গিয়ে সনাতনবাবুর রোগশয্যা-পার্শ্বে। তিনি হয়ত তাঁর জানালায় দু'টি আকুল চোখের প্রদীপ জ্বেলে রেখেছেন—কখন রতন আসবে! কখন তার ছোট্ট হাতখানি সনাতনবাবুর উত্তপ্ত ললাট স্পর্শ করবে!

॥ চৌদ্দ ॥

যে আবেগ নিয়ে রতন দ্রুতবেগে সনাতনবাবুর রোগশয্যা-পাশে ছুটে গিয়েছিল, বোধকরি তার চাইতেও আকস্মিক আঘাতে সে একেবারে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। হয়ত রতনের চলার শক্তি মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এ কী সনাতনবাবুর দু'টি চোখ অন্ধ হয়ে গেছে! একটা বুকফাটা আর্তনাদ করে রতন সনাতনবাবুর ডান হাতটা চেপে ধরলে। মুখে সে আর কোন কথাই বলতে পারলে না!

অনেকক্ষণ পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো সে। মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোয় না তার। শুধু ফোঁটা-ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ে সনাতনবাবুর বিরাট বুকটা ভাসিয়ে দিতে লাগলো।

এত দুঃখেও সনাতনবাবুর মুখ থেকে হাসি হারিয়ে যায় নি।

কৌতুক করে তিনি বললেন, 'কি রে রতন, তুই যে একেবারে কেঁদে ভাসিয়ে দিলি ?'

রতন রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'আপনি যে আর চোখে দেখতে পারেন না স্যার !'

এত বেদনাতেও হো-হো করে হেসে উঠলেন সনাতনবাবু। বুঝি পাষাণ ভেঙে নির্ঝরের জন্ম হল। বললেন, 'চোখে দেখতে পাবো না তাতে কি হয়েছে রে ? তোর তো দু'টি চোখ আছে। আজ থেকে তোর চোখের ভেতর দিয়ে আমি দেখবো। আর আমার কোনো অসুবিধেই থাকবে না।'

শুনে কিশোর রতন আবার হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো। মনে মনে ভাবলে, কি সে শক্তি যাতে সনাতনবাবু দু'টি চোখ হারিয়েও সমস্ত দুঃখ-কষ্টের ওপরে উঠে প্রাণ খুলে হাসতে পারছেন !

সনাতনবাবু বোধকরি ওর মনের কথাটি শুনতে পেলেন। তাই আপন মনে আবৃত্তি করলেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা—

"—মৃত্যুর গর্জন শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো,
দহিয়াছে অগ্নি তারে—
বিদ্ধ করিয়াছে শূল—
ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,—
সর্ব প্রিয় বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন—
চিরজন্ম তারই লাগি
জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন ॥"

রতন আপন মনে ভাবে, বিপ্লবীরা বুঝি মানুষ নয় ! নইলে নিজের দেহের অসহ্য যাতনাকে কি করে তারা ভুলে থাকতে পারে ? আগুনে হাত দিলেও তাদের মুখের ভাব দেখে মনে হয়, বুঝি তারা ফুলের বাগান থেকে টাট্‌কা তাজা সুগন্ধ কুসুম তুলে সাজি ভর্তি করছে !

এই যে সনাতনবাবু—রতন তাঁর সম্পর্কে কতটুকুই বা জানে ! বাইরে থেকে মনে হয় মানুষটা বুঝি ভাঁড় ! কখনো হাসছেন, কখনও রসিকতা করে মানুষকে হাসাচ্ছেন, আবার কখনো বা সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে চীৎকারে বাবুইবাসা বোর্ডিংকে মাথায় করে তুলছেন ; আবার সেই মানুষটি যখন আপন মনে বই পড়েন,

—রতন লুকিয়ে দেখেছে—তখন তিনি একেবারে বিশ্ব-জগৎ ভুলে বসে থাকেন। দেখে মনে হয় না সংসারে তাঁর কোনো ভাবনা-চিন্তা আছে!

সনাতনবাবুর সংসারে কে আছে রতন তার কোনো খবরই রাখে না। তাঁর কি বাবা-মা, ভাই-বোন কেউ নেই? কারো স্নেহের বন্ধন কি তাঁকে ঘরে আবদ্ধ রাখতে পারে না? এই দারুণ দুঃখের দিনে কারো স্নেহ-ছল-ছল আঁখি দু'টি কি তাঁর মনে একবারের জন্যও ভেসে ওঠে না?

মনে আরও প্রশ্ন জাগে রতনের—কি এমন শক্ত কাজ করতে গিয়েছিলেন সনাতন-বাবু, যার জন্য এই চোখ দু'টিকে তাঁর চিরতরে হারাতে হল?

সনাতনবাবু কিন্তু এ সম্বন্ধে ওকে কোন কথাই বললেন না—শুধু ওর ডান হাতটি চেপে ধরে পাথরের মূর্তির মতো চুপচাপ শুয়ে রইলেন।

আসল ব্যাপারটা জানা গেল—সেই দিন দুপুরবেলা। খাওয়া-দাওয়ার পর খানিকটা বিশ্রামের সময়। জীবনদাই ওকে সব কথা ধীরে ধীরে খুলে বললেন।

একটা খুব জরুরী দলিল সরিয়ে নিয়ে আসতে গিয়েছিলেন সনাতনদা। সঙ্গে ছিল এই বাবুইবাসা বোর্ডিং-এরই একটি ছেলে। ছেলেটা পূর্ব-পরিকল্পনা মতো দোতলার একটি সরকারী দপ্তরে উঠে ভেতর থেকে দরজা খুলে দেয়। তারপর সনাতনদা দালানের নল বেয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হন। টর্চ জ্বালিয়ে সেই অন্ধকার ঘরে ঢুকে দলিলটাও হাত করেছিলেন। কিন্তু ফিরে আসবার মুখে সঙ্গের ছেলেটা ধরা পড়ে যায়। তাকে ছাড়িয়ে আনতে গিয়ে সনাতনদা সিংহ-বিক্রমে রক্ষীদের আক্রমণ করেন।

রক্ষীদের মধ্যে একজনের হাতে ছিল মাছ মারবার একটা বাঁশের ট্যাঁটা—অনেক-গুলো তার মুখ। উপায়ান্তর না দেখে জান বাঁচাবার জন্য লোকটা সেই ট্যাঁটা সনাতনদার দিকে ছুঁড়ে মারে। তার ফলে সনাতনবাবুর দু'টো চোখই গেঁথে যায়। সেই অবস্থাতেই তিনি ছেলেটাকে বগলদাবা করে পাশের খালের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ওখানেই একটা ডিঙি নৌকো নিয়ে বিপ্লবীরা অপেক্ষা করছিল। তারা তাড়াতাড়ি জল থেকে দু'জনকে উদ্ধার করে নৌকো নিয়ে দ্রুতবেগে পালিয়ে আসে। কিন্তু সর্বনাশ যা হবার তা আগেই হয়ে গিয়েছে! চিরদিনের মতো সনাতদা তাঁর দু'টি চোখই হারিয়ে ফেলেছেন।

এই জীবন-মরণ সংগ্রামে সনাতনদা কিন্তু হাতের দলিলটা কিছুতেই ছাড়েন নি!

জ্ঞান হারাবার আগের মুহূর্তে তিনি শুধু ক্ষীণকণ্ঠে বলেছিলেন—ওরে, তোরা কেউ এই দলিলটা ধর, নইলে খালের জলে হারিয়ে যাবে।

রতন যেন নিজের চোখের সামনে গোটা দৃশ্যটা দেখতে পায়।

সিনেমাতে যেমন দেখা যায়—ঠিক তেমনি! রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে গিয়ে ডিঙি নৌকোটা থামলো সরকারী দপ্তরের পেছন দিককার খালে। ওদের দু'জনকে নামিয়ে দিয়ে নৌকোটা ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করে রইল।

ওদিকে সনাতনবাবু ছেলেটিকে নিয়ে অগ্রসর হলেন। ওকে কাঁধে করে তুলে দিলেন জানালার ওপর। ছেলেটি সাপের মতো এঁকেবেঁকে দোতলায় গিয়ে উঠল, তারপর কৌশলে পেছন দিককার দরজাটার ছিটকিনি খুলে দিল।

সনাতনবাবু মালকোঁচা মেরে তৈরী হয়েই ছিলেন। বৃষ্টির জলে ভেজা নল বেয়ে দোতলায় উঠে অন্ধকার ঘরে গিয়ে হাজির হলেন।

কোমরে লুকানো ছিল টর্চটা। সেইটে জ্বালিয়ে দরকারী দলিলটা খুঁজে নিতে বেশী বেগ পেতে হয় নি। কেননা বিপ্লবীরা আগে থেকেই খবরগুলো সংগ্রহ করে রাখে।

হঠাৎ ধুলো-বালি নাকে-মুখে ঢোকায় ছেলেটা খক্‌খক্ করে কেশে উঠলো।

রক্ষীরা সজাগ ছিল। শব্দ শুনেই তারা ছুটে এলো। সনাতনবাবু অবলীলাক্রমে পালিয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু ছেলেটাকে ওরা পেছন দিক থেকে আচমকা ধরে ফেললে।

বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর ছেলেকে ফেলে সনাতনবাবু নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে আসবেন—এ-কথা কোনোক্রমে কল্পনাও করা যায় না!

সিংহ-বিক্রমে রক্ষীদের আক্রমণ করতে গেলেন তিনি। কিন্তু তার আগেই বাঁশের সেই বহুমুখী ট্যাঁটাটা ছুঁড়ে দিয়েছে রক্ষীটি।

সনাতনবাবুর দু'টো চোখে বিঁধে গিয়েছে সেই ট্যাঁটা দু'টির তীক্ষ্ণ মুখ। দর-দর ধারে রক্ত ঝরে পড়ছে তাঁর দু'টি চোখ দিয়ে। ভিজে যাচ্ছে তাঁর মুখ, বুক, সারা দেহ —এমন কি, পরণের ধুতিও। কিন্তু তবু তিনি এতটুকু বিচলিত হন নি! বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর ছেলেটাকে বগলে জাপটে ধরে তিনি লাফিয়ে পড়েছেন—দোতলা থেকে একেবারে খালের জলে।

রক্তে খালের জলের রঙ রাঙা হয়ে গেছে—তবু তিনি হাতের দলিলটি ছাড়েন নি।

এই ভাবে—একের পর এক গোটা দৃশ্যটা মনে মনে কল্পনা করে শিউরে উঠলো রতন।

এই হচ্ছে বিপ্লবীর সহনশীলতা! ওরা ভাঙবে, তবু এতটুকু মচকাবে না।

সনাতনবাবুর শুশ্রূষার সব কিছু দায়িত্ব ধীরে ধীরে হাতে তুলে নিয়েছে কিশোর রতন।

কিশোর রতন মনে মনে কল্পনা করে ওর যদি সনাতনবাবুর মতো একটি দাদা থাকতো, তা'হলে সে তাঁর জন্য প্রাণ দিতেও এতটুকু পেছপা হতো না।

সকাল থেকে রতনের কাজের অন্ত নেই। ঘুম থেকে উঠেই চোখে-মুখে জল দিয়ে সনাতনবাবুর দাঁত মেজে, মুখ ধুয়ে দিতে হয়। বেডপ্যান ধরতে হয়; তারপর সেই বেডপ্যান যথাস্থানে নিয়ে গিয়ে পরিষ্কার করে আনতে হয়। গরম দুধ আর প্রয়োজনীয় পথ্য খাওয়াতে হয় সময়মতো। তা ছাড়া ঘড়ি ধরে ডাক্তারের নির্দেশ মতো ওষুধ খাওয়াতে হয়। ঠাণ্ডা মলম লাগিয়ে দিতে হয় দুই চোখের ওপর। ব্যাণ্ডেজ বাঁধাটাও সে শিখে নিয়েছে জীবনদার কাছ থেকে।

আরো একটা জরুরী কাজ থাকে তার দুপুরবেলা। রোগীকে রোজকার খবরের কাগজ আর নানা জাতীয় বইপত্তর পড়ে শোনাতে হয়।

এই কাজটা রতনের ভারী মনের মতো। সনাতনবাবুকে শোনাতে গিয়ে তার নিজের জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে ওঠে।

রাত্তিরে মাঝে মাঝে উঠে দেখতে হয় রোগী ঠিকমতো ঘুমুচ্ছেন কি না! যদি ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে তবে কখনো কখনো ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিতে হয়। আবার কোনো সময় মাথায় হাত বুলিয়ে নানা রকম গল্প করতে হয়। রোগীর ইচ্ছামতো রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা', সত্যেন দত্তের 'বেণু ও বীণা' কিংবা নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে হয়।

রোগীর সেবা করতে বসে রতনের নিজের যে কত শেখা হয়ে যাচ্ছে তার লেখা-জোখা নেই।

অনেক সময় সনাতনবাবু বলেন, 'ওরে রতন, তুই আমার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বল। বলতে বলতে ইংরেজীটা দিব্যি রপ্ত হয়ে যাবে।'

রতন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আমি কি ইংরেজীতে কথা বলতে পারবো?'

শুনে সনাতনবাবু হো-হো করে হেসে উঠেন; তারপর উত্তর দেন, 'ওরে বোকা, অভ্যেসে কি না হয়! মাদ্রাজের বহু কুলি ইংরেজীতে সায়েবদের সঙ্গে কথা বলে। অথচ তারা ABCD পর্যন্ত জানে না! বুঝলি—সবই অভ্যেস!'

সেদিন রাত্তিরে দারুণ গুমোট।

কারো চোখে আর ঘুম আসছে না।

জীবনদা আর রতন রোগীর শিয়রে বসে ধীরে ধীরে মাথায় আর কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

রোগীর মুখেও কোনো কথা নেই। শুধু এপাশ আর ওপাশ—শুধু ছটফটানি!

এমন সময় বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর একটি ছেলে হন্তদন্ত হয়ে সেই ঘরে ঢুকলো; বললে, 'জীবনদা, রোগীকে আর এখানে রাখা নিরাপদ নয়। পুলিশ বোধকরি কোনো রকমে টের পেয়েছে।'

শুনেই জীবনদা তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন; বললেন, 'আমি মনে মনে সেই

ভয়ই করছিলাম। তা'হলে আর দেরী নয়। সনাতনবাবুকে আজ রাত্রে—এক্ষুণি বোর্ডিং থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।'

জীবনদার কথা শুনে রতন চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলে, 'এক্ষুণি? এত রাত্রে?'

জীবনদা জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, এক্ষুণি। আমাদের দিন-ক্ষণ দেখবার সময় কোথায়? তা ছাড়া রাতের অন্ধকার আমাদের পরম বন্ধু। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে হলে এই রাতের অন্ধকার আমাদের একান্ত সুহৃদ। এই আঁধার আমাদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেবে। আঁধার ভেদ করে পুলিশের সদা-জাগ্রত চোখ আমাদের দেখতে পাবে না।'

'কিন্তু কোথায় যাবো আমরা?'—রতনের কণ্ঠে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা।

ছায়েদ বলে একটি ছেলে থাকতো বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ। সে এগিয়ে এসে বললে, 'আমার এক নানী থাকে অজপাড়াগাঁয়ে। নদীর ধারে জঙ্গলের মধ্যে আমার নানীর বাড়ি। বাড়ি বলতে ভাঙাচোরা একটা দালান—সাপ-খোপের বাসা। লোকে বলে ভূতুড়ে বাড়ি, নানীকে বলে ডাইনী। দিনের বেলাতেও কেউ সেদিকে এগোয় না। যদি নৌকো করে সেখানে নিয়ে যাওয়া যায়'—

জীবনদা যেন অন্ধকারে আলো দেখতে পেলেন; বললেন, 'ঠিক বলেছিস ছায়েদ।' ওই ভূতুড়ে বাড়িই সনাতনবাবুকে সব বিপদ থেকে আড়াল করে রাখবে। আর তোর নানী বুঝি ডাইনী? আমাদের ত' ভূত-প্রেত-ডাকিনী-যোগিনী আর ডাইনী নিয়েই ঘর করতে হবে। সমুদ্রে যে শয্যা পেতেছে শিশির দেখে তার ভয় পেলে চলবে কেন?

তারপর হাতে হাতে অতি দ্রুতবেগে সব কিছুর ব্যবস্থা। সনাতনবাবুকে ধরাধরি করে নৌকোয় তোলা হল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের বেগে নৌকো এগিয়ে চললো নদীপথে।

শেষ রাত্তিরে ছায়েদের সাড়া পেয়ে তার নানী একটা কুপি হাতে এগিয়ে এল। তারপর সনাতনবাবুর দিকে চোখ পড়তেই খ্যানখেনে গলায় চীৎকার করে উঠল, 'এ কোন্ ঘাটের মরাকে টেনে নিয়ে এলি রে ছায়েদ? দু'টো চোখের মাথাই যে খেয়ে বসে আছে!'

॥ পনেরো ॥

ছায়েদের নানীকে সবাই যে ডাইনী বলে কেন—সেটা জানা গেল পরদিন সকাল থেকে।

অতি ভোরেই খ্যানখেনে গলার আওয়াজে সবাইকার ঘুম ভেঙে গেল।

অতি ভোরেই নানী চীৎকার শুরু করে দিলে, 'ওরে ছায়েদ, ওঠ ওঠ। কুকড়ো চারটে আণ্ডা দিয়েছে! এ কিন্তু আমি প্রাণধরে কাউকে দিতে পারবো না। তোকেই কিন্তু এ চারটে আণ্ডা খেতে হবে।'

জীবনদা, রতন সবাই মাদুর বিছিয়ে দাওয়াতে শুয়ে পড়েছিল। শেষ রাত্তিরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় সবাইকার চোখে ঘুম জড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সাধ্যি কি দু' দণ্ড তারা শুয়ে থাকে ওখানে! বুড়ীর চিকণ গলার চীৎকারে সবাই উঠে বসলো।

জীবনদা চোখ কচলে হাসিমুখে বললে, 'তোমার কোনো ভয় নেই নানী! তুমি তোমার সব আণ্ডা ছায়েদকে খাইয়ে দাও। ওরই ত' এখন বুকে বল হওয়া দরকার। এখন খুব খাটনি যাবে ওর ওপর দিয়ে।'

বুড়ী চোখের ওপর হাতের চেটো রেখে শুধোয়, 'কেন, ওর খাটা-খাটনি হবে কেন? এদ্দিন বাদে ছায়েদ তার নানীর কাছে এলো—একটু আরাম করুক, আয়েস করুক। খাটা-খাটনির জন্যে ত' সারা জীবনটাই পড়ে রইলো।'

জীবনদা তবু রসিকতা করতে ছাড়লেন না; বললেন, 'শুধু কি ছায়েদই তার নানীর কাছে এসেছে? আমরা বুঝি একেবারে গাঙের জলে ভেসে এসেছি?'

এই কথা শুনে নানী এমন তীক্ষ্ণকণ্ঠে খ্যানখেন করে হেসে উঠলো যে, মনে হল বুঝি একটা কাঁসার বাসন কারো হাত থেকে পড়ে খান খান হয়ে ভেঙে গেল!

এই প্রাণ-কাঁপানো হাসির ভেতর দিয়ে বুড়ী হাসলো কি কাঁদলো ঠিক বোঝা গেল না।

রতন ফিস্‌ফিসে গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা জীবনদা, বুড়ীটা সত্যিই কি ডাইনী? কি রকম চোখের চাউনী দেখেছেন? যেন ভেতরটা অবধি দেখতে পাচ্ছে! তারপর ওই হাসি দিন কয়েক শুনলেই বুকের রক্ত শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে যাবে!'

জীবনদা হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, 'এত ভয় পাবার কি আছে রে বোকা? আমাদের ছায়েদেরই নানী। কাজেই মানুষ ত' বটেই। আস্তো চিবিয়ে গিলে খেতে ত' আর পারবে না।'

'কিন্তু তা'হলে লোকে ওকে ডাইনী বলে কেন ? জানেন ত—যা রটে তা কিছুও বটে।'—বললে রতন।

এমন সময় ঘরের ভেতর সনাতনবাবুর একটা গোঙানির শব্দ শোনা গেল।

রতন তাড়াতাড়ি ছুটে গেল ঘরের ভেতর।

সকালবেলাকার অনেক কাজ জমা হয়ে আছে।

সনাতনবাবুকে বহুক্ষণ দেখাশোনা করা হয় নি।

তাঁর মুখ ধোয়াতে হবে, বেডপ্যান ধরতে হবে, সকালবেলাকার ওষুধ খাওয়াতে হবে। বিছানাটা ঝেড়ে-পুছে ঠিক করে দেওয়া দরকার। তারপর রয়েছে সকাল-বেলাকার পথ্যি খাওয়ানোর পর্ব।

কাজেই রতন ডাইনীর ভীতিপ্রদ আলোচনা ছেড়ে নিজের রোজকার কাজ নিয়ে মেতে উঠলো।

ওদিকে জীবনদা দাওয়া থেকে নেমে সোজা খালধারে চলে গেলেন। ভালো করে মুখ-হাত ধুয়ে সুস্থির হয়ে ফিরে এলেন উঠোনে।

চারিদিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন জীবনদা। গত রাত্তিরের আলো-আঁধারী নিঝুম থমথমে পরিবেশে কোনো দিকেই তাকিয়ে দেখবার ফুরসৎ হয় নি।

ছায়েদের দাদামশাই জোতদার ছিলেন। এককালে তাঁর অবস্থা ভালোই ছিল।

জীবনদার চোখ দু'টি চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ছায়েদের দাদামশাই এই নির্জন খালের ধারে কোঠাবাড়িই তৈরী করেছিলেন। ছোট ছোট ইটের দেওয়াল। দেখে মনে হয় অনেক কালের পুরানো। দেয়ালের গায় কি সব নক্সা আঁকা। ভালো করে ঠাহর করা যায় না।

এককালে নাকি এই বাড়ি মানুষ-জনে গমগম করতো। দু' বেলায় অনেকগুলো পাত পড়তো।

ছায়েদের দাদামশায়ের দান-ধ্যানও ছিল বেশ। কাউকে তিনি নাকি বিমুখ করতেন না।

তারপর কি কাল মড়ক এলো গাঁয়ে। একে একে অমন জলজ্যান্ত স্বাস্থ্যবান ভাইগুলো পট-পট করে মরে গেল। মেয়েদের ভালো বিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু জামাইগুলো ছিল অমানুষ। তাই মেয়েরাও বেশীর ভাগ সময় এই বাড়িতে এসে মা-বাবার কাছেই থাকতো।

তারপর কোথা দিয়ে যে কি হল—কেউ হিসেব দিতে পারে না।

ছায়েদের দাদামশাই গফুর সাহেব এই সর্বনাশের বন্যাকে বাঁধ দিয়ে আটকাতে পারলেন না।

এমন সাজানো বাগান একেবারে যেন ছাগলে মুড়িয়ে রেখে গেল !

যখন চারদিকে ভালো করে তাকাবার অবসর পেলেন, তখন চোখে তাঁর ঘুম নেই। এক রাত্তিরের ভেতর চুল আর দাড়ি পেকে শনের গোছার মতো দেখাতে লাগলো।

আপনার জন যারা ছিল—যাদের জন্য কোঠাবাড়ি তৈরী করা—তারা সবাই ছেড়ে গেছে ! বাড়িটা খাঁ-খাঁ করছে। শূন্যপুরীতে বাতি জ্বালাবার জন্য শুধু বুড়ো-বুড়ী বেঁচে আছেন। কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতে পারেন না।

বুকটা হু-হু করে জ্বলে যায়—কিন্তু চোখ দিয়ে এক ফোঁটা কান্না বেরোয় না।

বুড়ো সারারাত ঘুমুতে পারেন না। শুধু উঠোনে পায়চারি করেন আর বলেন, 'আমার এত বড় বাড়ি, এতগুলো কামরা—এখানে থাকবে না কেউ ?'

এসব বলেন আর দু'হাতের আঙুল দিয়ে মাথার চুলগুলো টানতে থাকেন। দেখতে দেখতে চোখ দুটো করমচার মতো লাল হয়ে ওঠে।

এইভাবে বুড়ো পাগল হয়ে গেলেন। তখন বুড়ীই তাঁকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখতেন—পাছে পাগল মানুষটা কোনো সময়ে খালের জলে ডুবে মরতে যায়।

সে আজ কতকালের কথা। ছায়েদ তখন শিশু।

ওই মহামারীর সময় ছায়েদ এখানে ছিল না বলেই বেঁচে গিয়েছিল। ছায়েদ তখন তার নিজের বাপের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিল।

কিন্তু সে যে কবে তার মাকে হারালে, সে নিজে কখনো তা জানতেও পারে নি। বড় হয়ে এই নানীর কাছেই সে তার মায়ের গল্প শুনেছে !

ছায়েদের জীবনের সব কথাই জীবনদার জানা—কোনো কিছুই অজানা নয়।

তাই ত' তিনি শত অসুবিধার মধ্যেও এক কথায় ছায়েদের সঙ্গে এখানে আসতে রাজী হয়েছিলেন।

তিনি বেশ ভালো ভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই রকম একটি নির্জন-নিরিবিলি পোড়ো বাড়িই সনাতনবাবুকে সত্যিকারের আশ্রয় দিতে পারবে।

পুলিশ সনাতনবাবুর সন্ধান করতে জানা-অজানা বহু জায়গাতেই ঢুঁ মারবে। কিন্তু এই অজ-পাড়াগাঁয়ের কথা তাদের গোপন খাতার কোথায়ও লেখা নেই।

আরো একটা সুবিধের কথা ওরই মধ্যে ভেবে নিয়েছেন জীবনদা ! সেটি হচ্ছে ছায়েদের নানীর ডাইনী নামটি। এই নামটি রক্ষা-কবচের মতো সনাতনবাবুকে সকল রকম পুলিশী জুলুম থেকে বাঁচিয়ে রাখবে।

পুলিশ কখনো ধারণাতেই আনতে পারবে না যে, সনাতনবাবুর মতো একজন নামকরা বিপ্লবী—এই ডাইনীর আশ্রয়ে এসে আত্মগোপন করে আছে।

সবুজ রঙের কীট-পতঙ্গ যেমন গাছের সবুজ পাতার আড়ালে নিজেদের রক্ষা করে—এ ঠিক তেমনি ব্যবস্থা।

'ডাইনী' নামের ভয়ে গ্রামের কেউ এ বাড়ির ত্রিসীমানায় এগোয় না। বিপ্লবীর নিরাপত্তার দিক থেকে তার মূল্য আছে বৈ কি!

জীবনদা সেই উঠোনে দাঁড়িয়ে আপন মনে অনেক কথাই ভাবছিলেন। বাড়ির চারদিকে এত জঙ্গল জমে গেছে যে, বাইরে থেকে ভেতরে কি ঘটছে না-ঘটছে, কিছুই নজরে পড়ে না।

ছায়েদ সকলের আগেই উঠে গোয়ালাদের পাড়ায় চলে গেছে—সনাতনবাবুর জন্য দুধ রোজ করতে। এতক্ষণে সে ফিরে এলো এক ঘটি খাঁটি দুধ নিয়ে! ওটার দরকার পড়বে একটু বেলাতে।

ইতিমধ্যে সনাতনবাবু বার্লিজল খান। রতন দেখলে, উঠোনের এক পাশে চমৎকার একটি লেবুগাছ! অনেক লেবু ফলে রয়েছে সেই গাছে।

এ বাড়িতে লেবু তোলার লোক কোথায়? তাই রতন মনের আনন্দে ছুটে গেল গোটা কয়েক লেবু পেড়ে আনতে।

কিন্তু তার আগেই হাঁ-হাঁ করে পথ আটকে দাঁড়ালো সেই ডাইনীটা; বললে, 'খবরদার! এই লেবুগাছে তোমরা কেউ হাত দেবে না। এই লেবুগাছ কে পুঁতেছিল জানো? জানো না কেউ! আমার মেজ মেয়ের হাতে পোঁতা এই লেবুগাছের ফল কাউকে ছুঁতে দিই নে। যক্ষের মতো আগলে আছি আমি। আজ ছায়েদ এসেছে। সে খাবে এই লেবু। হি—হি—হি!'

পাগলের মতো হাসতে লাগলো ডাইনীটা। তার ওই রণচণ্ডী মূর্তি দেখে রতন ভয়ে দু' পা পেছিয়ে এলো! কি জানি,—বলা ত' যায় না! যদি ডাইনীটা ছুটে এসে তার হাতের আঙুল কামড়ে ধরে?

দূর থেকে ছায়েদ কিন্তু সব দেখেছে, সব শুনেছে। সে তার নানীর কাণ্ড দেখে এগিয়ে এসে বললে, 'ওরে রতন, তুই ভয় পাস নে। আমার মায়ের পোঁতা গাছ কিনা—তাই বুড়ী কাউকে ওগাছে হাত দিতে দেয় না। ওর ইচ্ছে, সব লেবু আমি বসে বসে চিবুই—পাগল আর কাকে বলে!'

বুড়ী কিন্তু শনের নুড়ির মতো চুলগুলো উড়িয়ে এগিয়ে এসে বললে, 'কী আমি পাগল? আমি কিন্তু কখনো পাগল হবো না। আমার মাথা সাফ আছে। পাগল হয়েছিল ত' তোর নানা। তাকে নিয়ে সারা জীবন কি আমি কম জ্বলেছি! তারপর মুখপোড়াটা করলো কি জানিস? একদিন পাটের দড়ি পাকিয়ে কড়িকাঠের সঙ্গে বেঁধে গলায় জড়িয়ে একেবারে ঝুলে পড়লো। ডাকাত বলতে চাস বল ডাকাত

—আর পাগল বলতে চাস ত' বল পাগল ! সে লাস টেনে নামালো কে শুনি ? এই ডাইনী ছাড়া আর কেউ নয় !'

ছায়েদ এগিয়ে এসে বুড়ীর পিঠে মাথায় হাত বুলোতে লাগলো।

তার ফলে সাপের মাথায় যেন মন্তর-পড়া ধূলো ছিটানো হল। বুড়ী ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে ছায়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কতক্ষণ, তারপর ঝর্‌ঝর্ করে কেঁদে ফেললে—যেন পাঁচ বছরের ছোট্ট খুকীটি !

ছায়েদ তখন তাকে নিয়ে দাওয়াতে বসলো। বললে, 'শোন নানী, এরা যে সব আমার সঙ্গে এসেছে, এরা ত' তোর মেহমান। এদের খাওয়াবি-দাওয়াবি, যত্ন-আত্তি করবি—তবে ত' আমি তোর কাছে কয়েকটা দিন থাকতে পারবো। নইলে যে আমাকেও ওদের সঙ্গে চলে যেতে হবে।'

ডাইনিটা যেন সেই কথা শুনে শিউরে উঠলো ! বললে, 'কোথায় যাবি তুই আমার কোল খালি করে ? তোকে আর আমি কোথাও যেতে দেবো না। শালিধানের চিড়ে কুটে রেখেছি। পাটালী গুড় রেখেছি কলসী ভর্তি করে। সবরী কলা পেকে রয়েছে গাছে। পুষ্করিণীতে টাটকা মাছ। এসব ফেলে কোথায় যাবি রে ছায়েদ ? এসব কি আমার কবরে ঢেলে দিতে চাস ?'

ছায়েদ তখন আদর করে নানীকে কাছে টেনে নিয়েছে। ছোট্ট খুকীকে সবাই যেমন করে আদর করে ঠিক তেমনি গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলছে, 'শোন নানী, তোর চিড়ে আমি খাবো। পাটালী গুড়ও ছাড়বো না। গাছের সবরী কলা দুধের সঙ্গে মেখে নেবো। কিন্তু আমায় তুই কথা দে—আমার একটা কথা তুই রাখবি ?'

বুড়ী মাথা দুলিয়ে আবদারের সুরে শুধোলে, 'কি কথা শুনি ?'

ছায়েদ বললে, 'আমার সঙ্গে যারা বাড়িতে এসেছে তাদেরকেও আমার মতন ভালোবাসবি—খাওয়াবি-দাওয়াবি, আদর করে কাছে ডেকে এনে কথা বলবি। ওরা যে আমাদের মেহমান—অতিথি।'

বুড়ী আনন্দে মাথা দোলাতে থাকে আর বলে, 'ওরা আমার মেহমান ? হ্যাঁ, হ্যাঁ ! ওরা আমার শূন্যি ঘর আবার ভরতি করে তুলবে। ওরে ছায়েদ, গাছে যত পাকা ফল আছে সব পেড়ে নিয়ে আয়। আমি ওদের দাওয়ায় বসিয়ে খাওয়াবো।'

অতি আনন্দে ডাইনী বুঝি দাওয়াতেই নেতিয়ে পড়লো।

* * * *

সেদিন গভীর রাত্রে রতনরা যখন ঘুমে একেবারে অচৈতন্য, ঠিক সেই সময় গাঁয়ের চৌকিদার লাঠি ঠুক ঠুক করে এসে হাজির। জিজ্ঞেস করলে, 'ও বুড়ী, তোর বাড়িতে কি কেউ এসেছে ? রাত্তিরে আলো জ্বলে কেন ঘরে ?'

বুড়ী পাগলের মতো হি-হি করে হেসে উঠলো। হাসলো অনেকক্ষণ ধরে; তারপর বললে, 'ওরে মুখপোড়া, আমার ঘর ভর্তি ছেলেমেয়ে ছিল। তারা যে রাত্তিরে এসে আমার কাছে খেতে চায়। তাই ওদের খেতে দেবো বলে পিদিম জ্বালি। ডাইনী ছাড়া আর কার কাছে নিশুতি রাতে ওরা খেতে আসবে শুনি? এখানে উঁকি দিতে এলে ধড়ে আর পরাণ থাকবে না! মুখ থুবড়ে পড়ে মরে থাকবি —হি-হি-হি!'

চৌকিদার ভয়ে ভয়ে নাম জপ করে—রাম-রাম-রাম। তারপর হাতের লণ্ঠনটা ফেলে রেখেই পালাতে পথ পায় না!

॥ ষোল ॥

পৃথিবীতে যে কত অবাক কাণ্ড ঘটে, ভাবতে গেলে বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না।

ডাইনী যে এমন করে মানুষকে আপনার করে নিতে পারে, সে-কথা রতনের জানতে বাকী ছিল। বুড়ী যেন তার দুই ডানা দিয়ে দুনিয়ার সব আপদ-বিপদ থেকে ওদের আগলে রাখতে চায়।

যে ডাইনীর রকম-সকম দেখে রতন মনে মনে পালাবার সঙ্কল্প করেছিল, আজ সে দাওয়ায় বসে জলভরা চোখ নিয়ে ভাবছে, এই নানীকে সে ছেড়ে যাবে কি করে। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে মানুষের হৃদয়ে এমন যে সুধা লুকিয়ে আছে বিপ্লবী দলে যোগ না দিলে কি সে জানতে পারতো!

বাবুইবাসা বোর্ডিংই তাকে সব পাইয়ে দিয়েছে। সনাতনবাবু, জীবনদা, পথের পাওয়া দিদি, আর আজকের এই নানী। এরা সবাই স্নেহ-প্রীতির ফল্গুধারায় তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। শেষ পর্যন্ত কোন্ ঘাটে গিয়ে সে তার ডিঙি বাঁধবে জানে না! এদের যে-কোনো একজনের সঙ্গে সে সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তার ত' উপায় নেই। বিপ্লবীর জীবনে কখনো শেকড় বসানো চলে না। সে হবে শুধু কদমের ফুল। যখন যেখানে ডাক পড়বে দুরন্ত ঘূর্ণি হাওয়ায় উড়ে সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হবে। যে ব্রত গ্রহণ করেছে, সেই ব্রত তাকে পালন করতেই হবে।

এখন দিনগুলো কত স্বচ্ছ, কত সুন্দর। তারা যে এই নিভৃত পল্লীতে আত্মগোপন

করে আছে, কাক-পক্ষীতেও তাদের খবর পায় না! এ এক চমৎকার লুকোচুরি খেলা।

ওরা যেন পাণ্ডবদের মতো অজ্ঞাতবাস করছে! কবে যে অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে ভারতের স্বাধীনতার সোনালী রোদ্দুরে মাথা তুলে দাঁড়াবে—তা ওরা জানে না। যতদিন সেই সঙ্কল্প সার্থক হয়ে না ওঠে, ওরা ধূপের মতো পুড়ে পুড়ে গন্ধ বিলিয়ে দিয়ে যাবে!

নানীর সজাগ ও সস্নেহ দৃষ্টিতে ওরা সবাই ছায়েদের সঙ্গে একাত্মা হয়ে গেছে। তিনটি ছায়েদকে যেন নানী একই সঙ্গে স্নেহের ঝর্ণায় অবগাহন করাচ্ছে! আজ আর ওরা পৃথক নয়। ওরা তিনজনেই এক বুড়ীর নাতির স্থান অধিকার করে বসেছে। কাকে নানী বেশী ভালোবাসে আজ এই নিয়ে তিনজনের কপট কলহ চলে। আর নানী হাততালি দিয়ে খিলখিল করে হাসে। তার সেই হাসি শুনে গাঁয়ের লোক শিউরে ওঠে! কেউ আর ভয়ে এদিক পানে পা বাড়ায় না।

অবশেষে একদিন সন্ধ্যের আঁধারে একটি নতুন লোক জীবনদার হাতে একটি চিঠি গুঁজে দিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিপ্লবীরা কৌতূহল প্রকাশ করতে নেই। তাই রতন একবার জীবনদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

জীবনদার কাছ থেকে ডাক এলো গভীর রাত্রে। সনাতনবাবু ঘরের ভেতর। জীবনদা ও রতন দাওয়ায় ঘুমুচ্ছিল। হঠাৎ কার হাতের ধাক্কায় রতনের ঘুম ভেঙে গেল। সেই লোকটা আর কেউ নয়—জীবনদা।

ফিস্‌ফিস্ করে জীবনদা বললেন, 'শোন, আয় আমার সঙ্গে চুপি চুপি। দেখিস যেন কারো ঘুম না ভাঙে। ও ঘরে ছায়েদ তার নানীর সঙ্গে ঘুমুচ্ছে। পায়ের এতটুকু শব্দ করবি নে। তাহলেই বুড়ী জেগে উঠে হাঁক ছাড়বে—কে যায়!'

দুরু-দুরু বক্ষে রতন জীবনদার পেছন পেছন খালের ধারে এগিয়ে যায়।

না জানি কি গুরুতর খবর এসেছে। জীবনদা ওকে নিয়ে খালের ধারে একটি গাছের আড়ালে বসলেন।

রতন কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় না, অবাক হয়ে জীবনদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

জীবনদাই ধীরে ধীরে খবরটা ভাঙলেন; বললেন, 'দেখ রতন, আবার তোর ডাক এসেছে। জানিস ত' ভাই, বিপ্লবীর যখন ডাক আসে, তখন সে কোনো কথা জিজ্ঞেস করবে না, কার কাছ থেকে আদেশ এলো জানতে চাইবে না, কোন ওজর-আপত্তি উত্থাপন করবে না। সঙ্গে সঙ্গে সটান হয়ে বলবে, হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত।'

রতন তখনো চুপ করে বসে।

এই আনন্দের নীড় ছেড়ে এত তাড়াতাড়ি তার কোথায়ও যাবার বাসনা ছিল না। কিন্তু…

'এসেছে আদেশ—
বন্দরের কাজ হলো শেষ।'

জীবনদা ওর মনের ভাবটা হয়ত বুঝতে পারলেন। তাই ধীরকণ্ঠে বললেন, 'আর একটা কথা মনে রাখবি রতন, মহাভারত ত' তোর ভালোই পড়া আছে। সেই যে অর্জুনের অস্ত্র পরীক্ষার ব্যাপারটা! গুরু দ্রোণাচার্য যখন জিজ্ঞেস করলেন —অর্জুন, তোমার সামনে কি দেখতে পাচ্ছ, আমায় জানাও। অর্জুন উত্তর দিলেন —পাখীটিকে দেখতে পাচ্ছি গুরুদেব। দ্রোণাচার্য জিজ্ঞেস করলেন—গোটা পাখীটাকে কি দেখেছ অর্জুন? অর্জুন উত্তর দিলেন—না গুরুদেব, শুধু পাখীর চোখটা দেখতে পাচ্ছি। দ্রোণাচার্য তখন সোল্লাসে আদেশ দিলেন, তা'হলে বাণ নিক্ষেপ করো অর্জুন। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্যভেদ! বিপ্লবী-জীবনের মূল কথাটাই তাই। আমাদের গোটা গাছটা দেখবার কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু যেখানে তাকাতে বলা হবে, আমরা শুধু সেইখানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো।'

খানিকটা চুপ করে রইলেন জীবনদা।

তারপর ধীরকণ্ঠে তিনি বললেন, 'তোর ওপর আজ একটি কাজের দায়িত্ব এসেছে। অবশ্য এই কাজের ভার আমার ওপর পড়লে আমি আনন্দের সঙ্গে চলে যেতাম। কিন্তু চিঠিতে নির্দেশ আছে ছোট ছেলের প্রয়োজন। আর সেই সঙ্গে তোর নামই উল্লেখ আছে। কাজেই তোকে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।'

নির্ভীককণ্ঠে রতন উত্তর দিলে, 'আমি প্রস্তুত জীবনদা! কে আদেশ পাঠিয়েছেন তাও আমি জানতে চাইব না। শুধু আমায় বলুন কি আমায় করতে হবে।'

জীবনদা রতনের পিঠে একবার হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর কাঁপা গলায় বললেন, 'দেখ, কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ কাজ আমি পেলে খুশী হতাম। কিন্তু দায়িত্ব এসেছে তোর ওপর। কাজেই মনে বল এনে তোকেই এ কাজে এগিয়ে যেতে হবে।'

রতন মুখে হাসি এনে বললে, 'বলছি ত' জীবনদা, আমি প্রস্তুত। শুধু আমাকে কাজটা ভালো করে বুঝিয়ে দিন। কোনো রকম কাজেই আমি পেছ-পা হবো না জানবেন।'

জীবনদা আবার ওর একটা হাত মুঠোর মধ্যে তুলে নিলেন; তারপর বললেন, 'আচ্ছা, মন দিয়ে শোন। আজ রাত্তিরেই তোকে রওনা হতে হবে। সঙ্গে পথের নিশানা রয়েছে।'

ক্ষীণ চন্দ্রালোকে জীবনদা সেই কাগজে আঁকা নক্সাটা মেলে ধরলেন।

দেখা গেল, ওরা যে খালটার পাশে বসে আছে, তাই আঁকাবাঁকা পথের একটা নিশানা। খালটা যেখানে রেললাইনের কাছে গিয়ে পড়েছে, সেইখানেই নক্সাটা শেষ হয়ে গেছে। চারদিকে উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম লিখে নক্সাটার দিক নির্ণয় করা হয়েছে।

রতনের কণ্ঠে বিস্ময়। সে জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা জীবনদা, এই নক্সাটা নিয়ে আমি কি করবো, সে-কথা ত' তুমি আমায় বললে না!'

জীবনদা জবাব দিলেন, 'আ-রে, সেই কথাই ত' বলতে যাচ্ছি। এখন মন দিয়ে শোন।'

আরো একটু চুপচাপ। কারো মুখে কোনো কথা নেই। রতন কিন্তু এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। সে জীবনদার হাত চেপে ধরে বললে, 'তুমি নিজেই বলতে ভয় পাচ্ছ জীবনদা!'

জীবনদা বললেন, 'না রে, না। শোন, বলি তবে, ওই যে খালের ওপর ঝোপের আড়ালে একটা ডিঙি নৌকো রয়েছে, ওইটে বেয়ে নিয়ে তোকে রেললাইন পর্যন্ত যেতে হবে। নিশুতি রাত, কেউ কোথাও জেগে নেই। খুব সাবধানে বৈঠে চালিয়ে যাবি, 'কাক পক্ষীতে যেন টের না পায়।'

রতন বললে, 'তা ত' যাবো। কিন্তু ওখানে এই আঁধার রাতে গিয়ে করবো কি শুনি?

'তা'হলে আসল কথাটাই খুলে বলি।' —এই বলে জীবনদা একটু নড়ে-চড়ে বসলেন; তারপর বলতে শুরু করলেন, 'আজ শেষরাত্তিরে ওই রেললাইন ধরে পূব থেকে পশ্চিমদিকে একটা গাড়ি যাবে ঠিক চারটে দশ মিনিটে। তখনো বেশ অন্ধকার থাকবে। ওই গাড়ির একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় থাকবে এমন এক জাঁদরেল সাহেব যে বহু বিপ্লবীকে দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছে, আর ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়েছে। এই শয়তানটার প্রাণ নেবার মহান দায়িত্ব পড়েছে তোর ওপরে।'

রতন এইবার উৎসাহিত হয়ে ওঠে। সে সোল্লাসে বললে, 'হ্যাঁ, এই ত' কাজের মতো কাজ পাওয়া গেছে। কিন্তু কি দিয়ে খতম করবো দুশমনটাকে? বন্দুক, না রিভলবার?

এইবার হেসে উঠলেন জীবনদা, 'না রে বোকা, না। বন্দুকও নয়, রিভলবারও নয়। চলন্ত ট্রেনকে খতম করতে চাই বোমা। আর আমি তোকে জঙ্গলের মধ্যে বোমা ছুঁড়তে শিখিয়েছি। আজ সেই বোমা ছুঁড়েই শয়তানটাকে শেষ করতে হবে, বুঝলি?'

আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলো রতন; গদগদ কণ্ঠে বললে, 'আমি এক্ষুণি রওনা হবো জীবনদা। কিন্তু বোমা কোথায় মিলবে, সেই কথাটা শুধু বলে দাও।'

জীবনদা জবাব দিলেন, 'এত ব্যস্ত হোস নি। সব মন দিয়ে শোন। এই নৌকো বেয়ে নক্সা অনুযায়ী তুই ঠিক জায়গায় গিয়ে হাজির হবি। ট্রেন আসার ঠিক পনের মিনিট আগে একটি ছেলে আসবে। এসে একসঙ্গে দু'টো শিস দেবে, তারপর বলবে 'সীতারাম'। তুই তাকিয়ে দেখবি, তার মাথায় একটি লাল গামছা বাঁধা আছে। সীতারামের উত্তরে তুই শুধু বলবি 'হরেকেষ্ট'। 'তাকে আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করবি নে। সে এসে নিঃশব্দে তোর হাতে দুটো বোমা দিয়ে সোজা অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। মনে থাকে যেন তাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করবি নে। সে কোথায় যাচ্ছে তাও জানতে চাইবি নে। শুধু বোমা দুটো হাতে নিয়ে তুই প্রস্তুত হবি। একটা বোমা যদি ব্যর্থ হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ছুঁড়ে দিবি। একটি কথা শুধু মনে রাখবি যে, প্রথম শ্রেণীর গাড়িগুলো ট্রেনের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় থাকে। হুঁশিয়ার!

এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো রতন জীবনদার কথা শুনছিল। এইবার তাঁর পায়ের ধূলো কপালে ঠেকিয়ে বললে, 'তুমি আমায় আশীর্বাদ করো জীবনদা, যেন আমি কৃতকার্য হয়ে ফিরতে পারি।'

মৃদু চন্দ্রালোকে হাত-ঘড়িটা দেখে নিয়ে জীবনদা বললেন, 'এখন দুটো বেজে দশ মিনিট। যথেষ্ট সময় আছে। তুই নীচে নেমে গিয়ে নৌকোয় উঠে বস। আমিও আর এখানে অপেক্ষা করবো না। Wish you good luck!

যেন একটা আঁধারের সাগরের ভেতর দিয়ে রতনের নৌকো তরতর করে এগিয়ে চলেছে। আকাশে মৃদু চন্দ্রালোক আছে বটে, তবে খালের যে দিকটায় গাছগুলোর ছায়া পড়েছে সে সেই অঞ্চল ধরেই নৌকো বেয়ে এগিয়ে চলেছে।

উঁচু বাঁধের ওপর রেললাইন। টেলিগ্রাফের তারগুলো যেন আঙুল উঁচু করে নিঃশব্দে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। খালের দু'ধারে ব্যাঙগুলো একটানা ডেকে চলেছে।

ক্ষিপ্রগতিতে ডিঙি নৌকোটা একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখে, রতন বাঁধের ওপরে উঠে জায়গাটা ভালো করে দেখে নিলে। দু'ধারে অজস্র ফণিমনসা আর বাসক গাছ জায়গাটাকে ছেয়ে রেখেছে। সেদিক দিয়ে লুকিয়ে থাকবার পক্ষে স্থানটি বেশ নিরিবিলি, আর লোকালয় থেকে অনেক দূরে।

স্থান নির্বাচন দেখে রতন ভারী খুশী হল। হাতের নক্সাটার সঙ্গে আবার ভালো করে মিলিয়ে দেখলে। হ্যাঁ, ফণিমনসা ও বাকসপাতার ঝোপের উল্লেখ আছে তার হাতের নক্সাতে।

রতন এইবার নিশ্চিত হল যে, ঠিক জায়গায় সে পোঁছুতে পেরেছে।

এখন তীর্থের কাকের মতো তাকে প্রতীক্ষা করতে হবে। কোন্ ছেলেটি আসবে

মাথায় লাল রঙের গামছা বেঁধে, তার হাতে থাকবে মারণ-অস্ত্র। তাই নিয়ে তাকে যথাসময়ে শত্রু নিধন করতে হবে।

রতন তার মনকে লোহার মতন শক্ত করেছে ; আর তার কোনো ভয় নেই।

পেছনে একটা শব্দ হতেই সে সেইদিক পানে তাকালে। না না, কোনো মানুষ নয়! বরং মানুষ দেখে একটা শেয়াল জঙ্গলের দিকে ভোঁ-দৌড় দিলে।

এখন রতনের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। দম বন্ধ করে সে প্রতীক্ষা করবে সেই ছেলেটির জন্য—যার আসার সঙ্গে তার ওপরে ন্যস্ত কাজ একেবারে একসূত্রে গাঁথা হয়ে আছে।

রতনের মনে হল আশে-পাশের গাছগুলো যেন সব কিছু জানতে পেরেছে। তারাও যেন এই গুরু দায়িত্বের নীরব সাক্ষী হয়ে আছে।

ওই যে একটু দূরে একটা বিরাট বটগাছ তার মোটা মোটা 'ব'গুলো মাটিতে নামিয়ে অপার কৌতুকে তাকিয়ে আছে ; ওই যে টেলিগ্রাফের তারগুলোর ওপর দুটি নাম-না-জানা পাখী অন্ধকারের মধ্যে তাদের পুচ্ছ দুটি নাচাচ্ছে, আবার ওই যে যজ্ঞডুমুরের গাছটা খালের জলে নিজের ছায়াটাকে ভালো করে নিরীক্ষণ করছে—সবাই তাকে নানা ভাবে সাহস দিচ্ছে। শত্রু নিধন করতে নীরবে তার প্রাণে প্রেরণা সঞ্চার করছে। এদের সবাইকেই সঙ্কল্প পালনের শুভ মুহূর্তে তার প্রয়োজন আছে। আশে-পাশে কাউকে বাদ দিলে সে সাফল্য লাভ করতে পারবে না।

হ্যাঁ, তার প্রতীক্ষা সার্থক।

ছেলেটি আসছে। তার মাথার লাল গামছাটা ঝোপের ওপর দিব্যি দেখা যাচ্ছে। সে কাছে এসে পড়েছে। রতনের বুকে কে যেন ঢেঁকির পার দিচ্ছে।

কানের কাছে দুটো শিস্ শোনা গেল। তারপর শোনা গেল—'সীতারাম'। সঙ্গে সঙ্গে রতন বললে, 'হরেকেষ্ট'।

হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে ব্রহ্মাস্ত্র। আর কাউকে ভয় করে না রতন।

ইতিমধ্যে সেই ছেলেটি কোন্ দিকে যে মিলিয়ে গেল—রতন তা ঠাহর করতে পারলে না। আর তাকে প্রয়োজন নেই। এইবার তার নিজের কাজ।

প্রাচীন ভারতের মুনি-ঋষিদের মতো সে যেন তপস্যায় বসেছে। কেউ তাকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারবে না।

হ্যাঁ—ওই যে দূরে ছুটে আসছে লৌহ-দানব। চোখটা তার ভাঁটার মতো জ্বলছে!

রতন নিজেকে প্রস্তুত করে নিল।

এই তো ট্রেনের মাঝামাঝি জায়গা। ছুঁড়ে দিল সে তার ব্রহ্মাস্ত্র—পর পর দু'টি।

দারুণ শব্দে একটা কামরা অনেক উঁচুতে উঠে খালের জলে পড়ে গেল। সেই সঙ্গে আরো কয়েকটি কামরা। আগুন ধরে গেছে গাড়িতে।

রতন সেই তীব্র ঝাপটায় যেন উড়ে গিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে পড়ে গেল।

তারপর কি ঘটলো সে আর কিছু জানে না।

॥ সতেরো ॥

আবার সেই বাবুইবাসা বোর্ডিং! বিস্ফোরণের ফলে ঝোপের মধ্যে ছিট্‌কে পড়ে রতন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

তারপর বিপ্লবী ভাইদের দল কি ভাবে ওকে তুলে নিয়ে সেই অন্ধকার থাকতে থাকতেই আট দাঁড়ের ছিপ বেয়ে একেবারে সোজা চলে এসেছে বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ সে খবর রতন কিছুই জানে না।

ওর জ্ঞান ফিরে এসেছে ছ'দিন পর। এই ঘটনার পরই সেই অঞ্চলে পুলিশের অত্যাচার শুরু হবে—সে তো জানা কথাই। তাই জীবনদার পরামর্শে ওকে সরাসরি এইখানে চালান করে দেওয়া হয়েছে।

আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে এসেছে রতনের। এক প্রবীণ কবিরাজ গোপনে ওর চিকিৎসা করছেন। তিনি রাত্তিরের অন্ধকারে এসে ওকে দেখে যান, আর প্রয়োজনীয় ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা করেন। তিনি নিজেও একজন নামকরা বিপ্লবী। এখন বেশ বয়েস হয়েছে, 'তাই প্রত্যক্ষ কাজ থেকে দূরে সরে এসে আহত বিপ্লবীদের চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। চিকিৎসা আর রোগ-নির্ণয়ে তাঁর সুনাম আছে। রতন তাঁর ব্যবস্থায় তাড়াতাড়ি দেহে-মনে বল পাচ্ছে।

রতন মনে মনে ভেবে রেখেছিল যে, একটু ভালো হয়ে উঠেই সে নানীর বাড়িতে ফিরে যেতে পারবে। ওখানে গিয়ে ছায়েদের সঙ্গে লেবুগাছ নিয়ে খুন্‌সুটি করতে না পারলে ওর আদৌ ভালো লাগছিল না। দেহটা পড়ে ছিল বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ, আর ওর মনটা ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সেই নিশুতি পুরীতে নানীর সঙ্গে। নানীর মুখ দিয়ে শুনতে চায় যে, ছায়েদের চাইতে, রতনকে নানী বেশী ভালবাসে!

শুধু মুখে বললেই হবে না। নানীর ফোকলা দাঁতের সেই খিল্‌খিল হাসিটিও রতন আর একবার শুনতে চায়। যে হাসিকে নিশুতি রাতে লোকে মনে করে, ডাইনীর হাসি, রতনের কানে সেই হাসিই মধু বর্ষণ করে।

কিন্তু মূলকেন্দ্রে থেকে আদেশ এলো অন্য রকম। জীবনদার মাধ্যমেই অবশ্য খবরটা এসেছে।

রতনকে এখন আর ভাঙার কাজ করতে হবে না। এইবার তার ওপর গড়ার কাজের ভার পড়েছে।

প্রথমটা রতন কিছুই বুঝতে পারে নি। একদিন জীবনদা হঠাৎ ধূমকেতুর মতো এসে উপস্থিত। তিনিই ওকে সব কিছু বুঝিয়ে দিলেন।

আবার ভালো ছেলের মতো ওকে ইস্কুলে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে। মাইনের জন্য ভাবনা নেই। মাসের পর মাস ওর ইস্কুলের মাইনে চালিয়ে যাবে বিপ্লবীদল।

এখানে থাকার খরচ আর ইস্কুলের দেয় সব কিছু জীবনদার হাত দিয়েই সে প্রতি মাসে পাবে।

এখন ওর কাজটা কি, সেই ব্যাপারটাই জীবনদা একটা ঘরের দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ ধরে বুঝিয়ে দিলেন।

তারপর জীবনদা যেমন ধূমকেতুর মতো বোর্ডিং-এ এসেছিলেন, ঠিক তেমনি কাউকে কিছু না জানিয়ে, হঠাৎ কোন আঁধার-পথে মিলিয়ে গেলেন।

এই ঘটনার দিন সাতেক পর থেকে আরম্ভ হল রতনের সংগঠনের কাজ।

ছেলেদের সঙ্গে মিলে-মিশে এক-একটা আসল মানুষকে খুঁজে বের করতে হবে।

"যেখানে দেখব ছাই—
উড়াইয়া দেখ তাই
পেলেও পাইতে পারো লুকানো রতন।"

প্রথমেই যে তাদের বিপ্লবীদলে গ্রহণ করা হবে তা মোটেই নয়। নানারকম কাজের ভেতর দিয়ে তাদের মনের বল, সাহস, একতা, নিষ্ঠা আর সহনশীলতার পরীক্ষা নিতে হবে। যে সব ছেলে শেষ পর্যন্ত সব রকম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, কেবলমাত্র তাদেরকেই বিপ্লবীদলে নাম লেখাতে দেওয়া হবে।

তারপর চলবে তাদের শিক্ষা, মানে ট্রেনিং। এই ট্রেনিং-এর কাজ চলবে খুব গোপনে, যাতে বাইরের লোক কিছুমাত্র খবর না পায়।

প্রথমেই ছেলেদের জন্য একটি ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সকাল-সন্ধ্যেয় ছেলের দল শরীরচর্চা করবে; কুস্তি শিখবে, যুযুৎসু অনুশীলন করবে।

যাতে দমটা খুব বাড়ে তার চেষ্টা করতে হবে সবাইকে। সাঁতারের ব্যবস্থাটা আবার চালু করতে হবে। মাঝে মাঝে ছাত্র-সমাজে দৌড়ের প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হবে। দৌড়ে যারা কৃতিত্ব অর্জ্জন করবে, তাদের জন্য নতুনভাবে শিক্ষাদানব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।

সবাইকার শরীর লোহার মত শক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। কেননা বিপ্লবীর চলার পথ কুসুমে ঢাকা নয়! কোথায় কোন্ অন্ধকার পথে সাপ লুকিয়ে আছে, বিপ্লবীকে ঝড়-বাদলের মধ্যে সেই বিপদের মাঝখান দিয়ে পথ চলতে হবে।

রতনের শিক্ষাদান-প্রণালীও একটু অন্য পথ ধরে চলে।

অল্প বয়সেই জীবনের অনেকখানি দেখে নিয়েছে সে। সেই উঁচু নীচু পথের অভিজ্ঞতার দাম বড় কম নয়।

যখন গভীর রাত্রে অঝোর ধারায় বর্ষণ চলে, 'ঠিক সেই সময় রতন চুপি চুপি ছেলেদের ডেকে নিয়ে নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ঘরে ঘরে সবাই তখন সুখ-শয্যায় নিদ্রা যায়, আর এই দস্যি ছেলের দল বজ্র-বিদ্যুৎ-বর্ষণকে মাথায় নিয়ে কেবল নদী পারাপার করতে থাকে।

দুঃখের দহনের ভেতর দিয়েই যে ভারতের স্বাধীনতার-সূর্য উদিত হবে, একথা এই বেপরোয়ার দল মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। তাই চলে ওদের বিপদসঙ্কুল পথে অভিনব অনুশীলন।

এক একদিন রতন ওদের গভীর জঙ্গলের ভেতর নিয়ে যায়। সে অঞ্চলটা লোকালয় থেকে অনেক দূরে।

সেইখানে সবার চোখের আড়ালে রতন ছেলেদের রিভলবার চালানো শিক্ষা দেয়। একটা নির্দিষ্ট গাছের গুঁড়িতে চুন দিয়ে গোল দাগ দিয়ে নেয়। মাঝখানে থাকে একটি ফোঁটা। সেই কেন্দ্রবিন্দুকে যে গুলীবিদ্ধ করতে পারবে, 'তারই হাতের নিশানা ঠিক হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।'

অনেক সময় অন্য বন্দুক দিয়ে উড়ন্ত পাখীকে গুলি মেরে মাটিতে ফেলতে হবে! সেই লক্ষ্যভেদে যারা কৃতিত্ব অর্জন করে রতন তাদের সাধুবাদ জানায়।

ব্যায়ামাগারের মাটি কুপিয়ে ঝুরঝুরে করে সেইখানে চলে ছেলেদের কুস্তিশিক্ষা। রীতিমত কুস্তি করলে শরীর খুব বলিষ্ঠ হয়! কুস্তির পরে বিশ্রাম করে ওরা ভিজে ছোলা আর গুড় খায়!

অনেক সময় গরু কিংবা মোষের দুধ পানিয়ে গরম গরম ফ্যানাসুদ্ধ তাই পান করে! এতে দেহে শক্তি সঞ্চার হয়।

শরীরকে শক্ত করতে হবে, আর দেহ থেকে রোগ-ব্যাধির বালাইকে দূরে তাড়িয়ে দিতে হবে।

যে সব সময় 'মাথা গেল, পেট কামড়াচ্ছে' কিংবা 'পায়ে ব্যথা হয়েছে' বলে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে, মুক্তি সংগ্রামে তার এতটুকু স্থান নেই।

তাই সবার আগে চাই শক্ত দেহ আর সরল মন।

গোটা ইস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেছে। আশে-পাশের গ্রাম থেকেও অনেক ছাত্র এসে ব্যায়ামাগারে ভর্তি হয়েছে।

দেহ চর্চার সঙ্গে মনের চর্চাও চলছে।

এদের ভেতর থেকে সব ছেলেকেই যে বিপ্লবীদলে নেওয়া হবে তা কিন্তু মোটেই নয়।

যারা সব কাজে সেরা, দিনের পর দিন তাদের বাছাই করেই আসল কাজের জন্য তালিকাভুক্ত করে নেওয়া হবে।

বিশ্বকর্মার দৃষ্টি নিয়ে রতন সকলের দিকে তাকিয়ে থাকে। কোন্ ঘরে যে আগামী দিনের যোদ্ধা তৈরী হচ্ছে তা কেউ জানে না। কাউকে সে হেলা করে না। সকলের মধ্যেই বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে।

তাই তো সে সাহসী মানুষ গড়বার ব্রত গ্রহণ করছে। ঘরে ঘরে সবাইকে ডাক দিয়ে যাবে সে। যে ঘুমে একেবারে অচেতন, তার ঘুম হয়তো ভাঙবে না। কিন্তু সজাগ ছেলেরা নিশ্চয় তার ডাকে সাড়া দেবে। এই তার একমাত্র ভরসা!

নানা জাতীয় প্রতিযোগিতা চলছে ছেলেদের মধ্যে। দূর পাল্লার হাঁটা, ডন-বৈঠকের প্রতিযোগিতা, সাঁতারের প্রতিযোগিতা, অন্ধকারে হাঁটার প্রতিযোগিতা, সাহসের প্রতিযোগিতা, ছেলেদের মধ্যে সব কিছুরই অনুশীলন চলছে।

একদিন রতন ঘোষণা করলে, 'তোমাদের মধ্যে সাহসের প্রতিযোগিতা হবে।' প্রতিযোগিতায় কে কে নাম দিতে চাও, 'এগিয়ে এসো!'

ঝোঁকের মাথায় অনেক ছেলেই এসে নাম লিখিয়ে গেল। কিন্তু রতন যখন আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে, তখন বহু ছেলেই পেছু হটতে শুরু করলে।

কেউ বললে, মা রাজী হচ্ছেন না। কেউ ওজর দেখালে, বাড়িতে পিসীমার ভারী ব্যামো। তাঁর সেবা করতে হয়—রাত জেগে। কেউ বললে, সন্ধ্যার পরেই দারুণ ঘুম পায় যে! অত রাত্তিরে ওখানে যাবো কি করে?

রতনের প্রস্তাবটা একটু বিদঘুটে বৈ কি! অমাবস্যার রাত্রে, ঠিক রাত বারোটার সময় একা একা নদীর ধারের শ্মশানে গিয়ে একটি খুঁটি পুঁতে আসতে হবে। সেই খুঁটির মাথায় একটি নিশান বেঁধে দিয়ে আসা চাই। একে একে যেতে হবে। দল বেঁধে যাওয়া চলবে না।

প্রথমে অনেকের নামই তালিকাভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু শেষকালে কেউ কেউ ওজর-আপত্তি ও অসুবিধার কথা জানিয়ে নাম কাটিয়ে চলে গেল।

শেষ পর্যন্ত তিনটি ছেলে কিছুতেই পেছ-পা হয় নি। তারা অমাবস্যার রাত্রে শ্মশানে যাবে বলেই স্থির হল।

বাবুইবাসা বোর্ডিং হল কাজের ঘাঁটি।

সেইখানেই সব ছেলে জমায়েত হল। লটারী করে স্থির হল কে আগে যাবে।

রতন ব্যাপারটা সব বুঝিয়ে দিলে। সঙ্গে কোন আলো কিংবা টর্চ নেওয়া চলবে না; চীৎকার করে গান গাইতে গাইতে দশটা পাড়াকে জানিয়ে যাওয়া চলবে না। নিঃশব্দে চলে যেতে হবে।

হাতে থাকবে সেই বাঁশের খুঁটি আর পতাকা। বাঁশের খুঁটিটা ইটের টুকরো দিয়ে ঠুকে মাটিতে বসিয়ে দিয়ে, তার মাথায় নিশানটা বেঁধে দিয়ে আসতে হবে।

প্রথম যার নাম উঠেছে তার নাম জয়ন্ত। জয়ন্তের সত্যি সাহস আছে।

এমনিতেই সে রাত-বিরেতে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। অন্ধকারে চলতেও সে সাপের ভয় করে না। এ ছাড়া সে চমৎকার বাঁশী বাজাতে পারে।

জয়ন্ত একবার শুধু জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা, আমি বাঁশী বাজাতে পারব তো?'

রতন উত্তর দিলে, 'মোটেই না। বাঁশী বাজিয়ে তুমি মনটাকে অন্য দিকে ঠেলে দিতে চাও। তার মানে, ওই ভাবে তুমি মনের ভয়টাকে দূর করে দিতে মনস্থ করেছ। তা কিন্তু চলবে না। গান গাওয়া কিংবা বাঁশী বাজানো আদৌ গ্রাহ্য হবে না। শুধু নিজের মনের জোরে এগিয়ে যাবে। গান গাওয়া কিংবা বাঁশী বাজানো মানেই তুমি একটি সঙ্গী চাইছ। তার সঙ্গে গল্প বলে তুমি মনের ভয়টাকে আমল দিতে অনিচ্ছুক!'

যাই হোক শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, জয়ন্ত একাই যাবে। বাঁশের খুঁটি আর পতাকা নিয়ে সে রওনা হল। ছেলেরা কেউ কেউ শাঁখ বাজালে, কেউ কেউ উলুধ্বনি দিয়ে তাকে উৎসাহিত করলো।

ভয়-ডর কাকে বলে জয়ন্ত জানে না। আপন মনেই সে এগিয়ে চললো। নদীর ধার দিয়ে চেনা পথ। না-ই বা থাকলো আকাশে চাঁদ, আকাশভরা তারার আলোতেই বেশ বোঝা যাচ্ছে পথের রেখা।

ঝাউবন পেরিয়ে শ্মশানের দিকে আঁকা-বাঁকা পথ ধরলো জয়ন্ত।

ওই তো দূরে মরা-পোড়া ঘরটা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

শ্মশানের দিকে যেতে—বাঁ দিকে একটা ইটের খোলা পড়ে। জয়ন্ত সেইখান থেকে একটা ভাঙা ইট কুড়িয়ে নিলে। এইটে ঠুকে-ঠুকে বাঁশের খুঁটিটা মাটিতে পুঁততে হবে।

সদর রাস্তা ছেড়ে আরো কিছু দূর চলে যায় জয়ন্ত! তার পাশ দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে কি একটা জানোয়ার খুব জোরে ছুটে পালিয়ে গেল।

এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালো জয়ন্ত।

নাঃ, ওটা একটা শেয়াল।

শেয়ালটা হয়তো অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে আধপোড়া মড়া খাচ্ছিল। বহু লোক কাঠের অভাবে শেষ পর্যন্ত মড়া পোড়ায় না, ফেলে রেখে চলে যায়। এই জাতীয় ঘটনা হামেশাই ঘটে।

জয়ন্ত মনে মনে স্থির করে নিলে, সে এতটুকু ভয় পাবে না। আর ভয় পাবার আছেই বা কী ? দিনের বেলা সূর্যের আলো থাকে—এখন তারই অভাব।

অন্ধকার তো আর রাক্ষস নয়। ভয়ের কি আছে ? জয়ন্ত এগিয়ে চলে।

একটা জায়গা বেছে নিয়ে দমাদ্দম পিটতে থাকে খুঁটিটাকে। মনে হল বেশ বসে গেছে। তারপর সে নিশানটা টাঙিয়ে দিলে খুঁটিটার মাথায়।

ব্যস্! কাজ খতম।

কিন্তু যেই ফিরতে যাবে—কে যেন জয়ন্তের কোঁচা টেনে ধরেছে ? যত টানে খোলে না !

তবে কি মহা শ্মশানে ভূত-প্রেত, দৈত্যি-দানোব কেউ আছে ? দর-দর করে ঘাম ঝরতে থাকে জয়ন্তের সারা গা দিয়ে।

গোঁ-গোঁ শব্দ করে জয়ন্ত সেইখানেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে !

* * *

এক ঘণ্টা বাদেও যখন জয়ন্ত ফিরে এলো না, তখন রতন দলবল নিয়ে সেইখানে এসে হাজির।

টর্চ দিয়ে জয়ন্তের জ্ঞানহীন দেহটা শুধু দেখলে ওরা।

তারপর রতন বললে, 'হুঁ ! যা ভেবেছি তাই। ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে জয়ন্ত নিজের কোঁচাটাই খুঁটির সঙ্গে পুঁতে ফেলেছিল। তারপর যেই রওনা হতে গেছে—অমনি পিছু টান।'

আসলে মনের ভয়ই মানুষকে কাবু করে ফেলে। সেই দিন জয়ন্তের জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে ওদের বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল।

॥ আঠারো ॥

বৃটিশের চ্যালা-চামুণ্ডা—যারা তখন আমাদের দেশ শাসন করতো, তারা আমাদের দেশেরই মানুষ। কিন্তু তারা মনে করতো, এই যে বৃটিশ রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না—এর সমস্ত গর্ব আর গৌরব তাদের। পীড়ন করে হোক, শয়তানী করে হোক, নিজের দেশে মানুষদের কারাগারে পাঠিয়ে হোক—বৃটিশ রাজত্ব এই দেশে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। রাজার জাতের পায়ে যাতে কাঁটাটিও ফুটতে না পারে, তারই খবরদারী করবার জন্যই তাদের জন্ম হয়েছে। তারা সরকারী চাকরী পেয়েছে সেই মহৎ কাজকে সকল দিক দিয়ে সফল করে তোলবার জন্য।

এই কথা তখনকার দিনের আমলারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতো।

এই সব যো-হুকুমের দল জানতে পেরেছিল যে, একদল বিপ্লবী তরুণ তাদের নিজেদের সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে দেশকে স্বাধীন করার ব্রত গ্রহণ করেছে। এই বিপ্লবী দল আপন স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করছে না, নিজেদের সংসারের সুখের কথা ভাবছে না , নিজেদের উপার্জনের কথা চিন্তা করছে না, শুধু ভাবছে—মাতৃভূমিকে কি করে স্বাধীন করা যায়! কি উপায়ে বৃটিশকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের জাতীয় পতাকা ভারতের বুকে উঁচু করে তুলে ধরা চলে। এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য বিপ্লবীদের কোনো ত্যাগই ত্যাগ নয়।

এই কাজের জন্য সোজা পথে না গিয়ে তারা আঁধার পথে পা বাড়িয়েছে। ঘরের সুখ-শয্যা পরিত্যাগ করে সর্প-সঙ্কুল পথে অমানিশা রাত্রে নীরবে অভিযান চালিয়েছে।

কবি ত' তাদের উদ্দেশ্য করেই গান বেঁধেছেন—

"আপন জনে ছাড়বে তোরে—
তা বলে ভাবনা করা চলবে না—
ও তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে
হয়ত রে ফল ফলবে না!
আসবে ঘিরে আঁধার নেমে—
তাই বলে কি রইবি থেমে ?
ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি—
হয়ত বাতি জ্বলবে না।
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।"

এই বিপ্লবী দল যে গোপনে গোপনে দেশের মধ্যে নীরবে স্বাধীনতার ব্রত উদ্‌যাপনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে—সে কথা যো-হুকুমের দল যে করেই হোক জানতে পেরেছিল।

তাই তারাও ঠিক করলে, এই বিপ্লবকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে হবে। আমলারা আরও খোঁজ পেয়েছিল যে, বাংলাদেশের বিদ্যালয়গুলোর ভেতর দিয়েই এই প্রস্তুতি চলছে। দেশের সমস্ত ছেলেমেয়েকে যদি সঙ্ঘবদ্ধ করা যায়, তা'হলে বৃটিশ রাজত্বে ফাটল ধরবে—আর তাকে রক্ষা করা যাবে না।

এখানে ওখানে স্বদেশী ডাকাতির খবর তারা পেয়েছে, আর অত্যাচারী লালমুখদেরও যে ধ্বংস করবার চেষ্টা চলছে—ট্রেন ধ্বংসের পরিকল্পনা থেকে সে কথাও তারা বেশ জানতে পেরেছে।

তাই ওপর থেকে হুকুম এলো—শিক্ষা-বিভাগের ভেতর দিয়ে বিদ্যালয়গুলোর ওপর পীড়ন চালাও। ছাত্রদল যাতে কোনো রকম স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করতে না পারে সেজন্য প্রখর দৃষ্টি রাখো।

অন্যান্য বিদ্যালয়ের মতো—এই বাবুইবাসা বোর্ডিং আর তার ইস্কুলের ওপরও কড়া চিঠি এলো। কিন্তু যখন দেখা গেল, কিছুতেই ছাত্রদলকে শায়েস্তা করা যাচ্ছে না, তখন শিক্ষা-বিভাগের পরিদর্শক এলেন বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে।

বাবুইবাসা বোর্ডি-এর একটা বদনাম চিরকালই ছিল। তার ওপর যখন ওপর থেকে আদেশ পাওয়া গেল—তখন পুরোনো ঝাল ঝাড়বার একটা সুযোগ পেয়ে যো-হুকুমের দল সত্যি উল্লসিত হয়ে উঠলো। আমাদের দেশে একটা চলতি কথা আছে যে, ধরে নিয়ে আসতে বললে বেঁধে নিয়ে আসে। এখানেও অবস্থাটা দাঁড়ালো ঠিক সেই রকম।

একদিন কাউকে কিচ্ছু না জানিয়ে একদল সরকারী কর্মচারী, বিদ্যালয়ের পরিদর্শক আর সেই সঙ্গে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার এসে হাজির হলেন বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ।

আগে থাকতেই আট-ঘাঁট বেঁধে কাজ করেন এঁরা। তাই সাবধানের বিনাশ নেই! শেষ রাত্তির থেকে খানাতল্লাসী শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু বিপ্লবী ছাত্রদল যে আরো চালাক সে-কথা যো-হুকুমের দলের জানা ছিল না!

বৃটিশ সরকার তাদের কার্যসিদ্ধির জন্য যেমন গোপনে গুপ্তচর নিয়োগ করে থাকে, তেমনি বিপ্লবী দলের গোপনকর্মী আছে। তারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে দুরূহ কাজ সম্পন্ন করে। এরা তখনকার দিনে ছড়িয়ে ছিল সরকারী দপ্তরখানায়, বিভিন্ন থানাতে, আমলাদের বাড়ির অন্দর-মহলে, এমন কি বড় বড় অফিসারের ছেলে, মেয়ে, ছেলে-বৌদের পর্যন্ত বিপ্লবীদল নিজেদের

সমিতির অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল—বিপ্লবী কাজের সকল রকম সুবিধের জন্য। আমলার দল তখনো এত ঘটনা ভাল করে জানতে পারে নি।

যে রাত্রে বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ খানাতল্লাসী হবে তার আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় ছেলের দল তাদের মূলকেন্দ্রের গোপন চিঠিতে সব কিছু জানতে পারে। কাজেই রতন সেদিন গভীর রাত্রে বোর্ডিং-এর একটা নিরালা ঘরে বিশ্বাসী বিপ্লবী ছাত্রদের একটা পরামর্শ সভা আহ্বাহন করে।

একদল ছাত্র বলে, চলো, আমরা দিন কয়েকের জন্য গা-ঢাকা দি। তা'হলে দেশের শত্রুরা এসে কোনো কিছুরই হদিস পাবে না।

রতন জবাব দিলে, 'না ভাই, তাতে ওদের সন্দেহ আরো বাড়বে। ওদের মনে এই ধারণা হবে যে, একদল বিপ্লরী এখানে বাসা বেঁধেছে। গুপ্তচরেরা সব সময় দৃষ্টি রাখবে এই বোর্ডি-এর ওপর। ফলে আমাদের সবাইকার জীবন একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে।'

ছেলেরা জিজ্ঞেস করলে, 'তা'হলে আমরা এখন কি করবো? আমাদের এই বোর্ডিং-এর অনেক রিভলবার, কিছু অস্ত্রশস্ত্র আর বোমা-বারুদ লুকোনো আছে। সেগুলোর কি ব্যবস্থা করা যাবে?'

রতন হাসতে হাসতে উত্তর দিলে, 'দেখ ভাই, পালিয়ে ওদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। তার চাইতে এসো, আমরা ওদের সঙ্গে বুদ্ধির খেলা খেলি। ওরা যদি যায় ডালে ডালে, :তবে আমরা যাবো পাতায় পাতায়। দেখি সে খেলায় কে জেতে, আর কে হারে।'

একটি ছেলে জিজ্ঞেস করলে, 'সেই খেলাটা আমরা কি ভাবে খেলবো—আমাদের ভাল করে বুঝিয়ে দাও না। আমাদের যে শিয়রে সংক্রান্তি। সময় আর মোটেই হাতে নেই।'

রতন বললে, 'ভয় পাবার কোনই কারণ নেই। এক্ষুণি আমি সবাইকে কাজ ভাগ করে দিচ্ছি।'

সঙ্গে সঙ্গে কাজের তালিকা তৈরী হয়ে গেল।

বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর কাছেই একটা নিবিড় জঙ্গল ছিল। দিনের বেলাতেও সেখানে কেউ ঢোকে না।

একদল ছেলে সেখানে গিয়ে টর্চ ধরবে, আর একদল রাতারাতি গর্ত খুঁড়ে ফেলবে।

এই দুই দল ছাত্রকে রতন পাঠিয়ে দিলে জঙ্গলের ভেতর।

ওরা একটি বড় বটগাছের তলায় জায়গা ঠিক করে—গভীর একটি গর্ত খুঁড়ে ফেলল।

রতন তখন আর কয়েকজন ছেলের সহায়তায় থলে ভর্তি করে লুকিয়ে রাখা রিভলবার, আর অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সেই গর্তের ভেতর সেঁধিয়ে দিল। তার ওপর রইলো কিছু খড় আর কাঠের গুঁড়ো। তার ওপর মাটি চাপা দিয়ে দিব্যি ঘাসের চাপড়া বসিয়ে দেওয়া হল। তখন কে দেখে বলবে যে, এই জঙ্গলের ভেতর গর্ত খোঁড়া হয়েছে, আর তার তলায় এত মজার ব্যাপার লুকিয়ে আছে !

আর দু'টি ছেলেকে রতন নৌকো করে কাছের গঞ্জে পাঠিয়ে দিলে পরদিন সকালবেলা। সেখানে কিছু জিনিস কেনা-কাটা করতে হবে। ওদের বার বার সাবধান করে দিলে রতন যেন জিনিসগুলো কিনে তাড়াতাড়ি বোর্ডিং-এ ফিরে আসে। কেননা, তার পরও অনেক কাজ সবাই মিলে শেষ করতে হবে।

সারাদিন ধরে এঘরে-ওঘরে খুটখাট কাজ চললো। অন্যান্য ছেলেরা ইস্কুলে চলে গেছে। শুধু কয়েকটি বিশ্বাসী ছাত্রকে রতন যেতে দেয় নি। তারাই ক্ষিপ্রগতিতে সব কাজ সমাধা করে ফেলেছে।

সেদিন বোর্ডিং-এর খাওয়া-দাওয়ার পাট সন্ধ্যের মুখেই সেরে ফেলা হল।

সব ঘরেই ছাত্ররা পড়তে বসেছে। পড়াশোনায় এত মনোযোগ ছেলেদের এর আগে আর কখনো দেখা যায় নি। প্রতিটি কামরায় আলো জ্বলছে। ছেলেরা শান্তশিষ্ট হয়ে বিভিন্ন বিষয় মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে মুখস্থ করছে। কেউ পড়ছে ইংরেজী, কেউ ইতিহাস, কেউ ভূগোল, কেউ জ্যামিতি, আবার আর একদল ছেলে বাংলা কবিতা মুখস্থ করতে লেগে গেছে।

এ যেন একেবারে শটির বনের পাঠশালা বসে গেছে। সবাই শেয়াল পণ্ডিতের পড়ুয়া ছাত্র। কুমীর খুড়ো এলেই—চালাকির বুদ্ধিতে তাকে বোকা বানিয়ে ঘরে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

সন্ধ্যের বেশ কিছু বাদে একটি নতুন ছেলে, একটি চিঠি নিয়ে রতনের কাছে হাজির হল।

রতন সেই চিঠি পড়ে জানতে পারলে—বোর্ডিং-এ যারা খানাতল্লাসী করবে সেই বীর-বাহিনী নানা সাজে সজ্জিত হয়ে রওনা হয়েছে। তাদের মনে এ বিশ্বাসও আছে যে, আত্মরক্ষার জন্য বোর্ডিং-এর ছেলেরা বোমা ছুঁড়তে পারে কিংবা রিভলবার ব্যবহার করতে পারে। তাই ওরাও নানা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত যেন যুদ্ধযাত্রা করেছে !

চিঠিখানি পড়ে রতন মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো। তারপর প্রদীপের আলোতে ধরে সেই জরুরী পত্রখানি সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়ে ফেললো !

সেই নতুন ছেলেটির দিকে তাকিয়ে সে বললে, 'সব ঠিক আছে। আমি আর নতুন কোনো চিঠি দেবো না। তুমি এক্ষুণি মূলকেন্দ্রে ফিরে যাও। এ অঞ্চলে

তোমায় কেউ চেনে না। তুমি একেবারে নতুন মুখ। ওদের গুপ্তচর চারদিকে সব সময় ঘোরাফেরা করছে। তাই তোমার তাড়াতাড়ি এ জায়গা ছেড়ে যাওয়াই ভাল।

ছেলেটি মাথা নেড়ে তার মুখখানি চাদরে ভাল করে ঢেকে নিয়ে বাইরের অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল, আর তার কোনো হদিস পাওয়া গেল না।

সারা বোর্ডিং অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

ঘড়ির পেণ্ডুলামের শব্দটা টক্‌টক্ করে কানে ভেসে আসছে।

রতনের চোখে ঘুম নেই। সে চুপ করে শুয়ে আছে। আর ঘড়ির শব্দটা সব সময় তাকে সচেতন করে দিচ্ছে।

আজকে রাতের অতিথির জন্য তাকে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতে হবে বৈ কি!

এদের অভ্যর্থনার জন্য রতন অন্যরকম ব্যবস্থাও করতে পারতো।

নৈশ আকাশের নীরবতাকে খানখান করে ভেঙে দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র গর্জন করে উঠে শত্রুকে মুহূর্তে ধরাশায়ী করতে পারতো। ওদের বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারতো বোমার প্রচণ্ড আঘাতে!

কিন্তু তাতে কাজ কিছুই হবে না। শুধু জানিয়ে দেওয়া হবে যে, বিপ্লবী দল এই বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ সত্যি সত্যিই নীড় বেঁধেছে। তার ফলে অকারণে কয়েকটি নিরীহ ছেলেকে ওরা ধরে নিয়ে যাবে। অমানুষিক পীড়ন করবে তাদের! কারাগারে পাঠিয়ে দেবে এখানে ওখানে।

কিন্তু রতন তা চায় না। চরম আঘাত হানবার সময় এখনো আসে নি।

বিপ্লবীদের ভাল করে প্রস্তুত হতে হবে। তার জন্য আরো কিছু সময় চাই।

আজ বুদ্ধির যুদ্ধে তাদের জিততে হবে।

শেষ রাত্তিরে সত্যি হানাদাররা এসে হাজির হল। ছেলেদের মুখ-চোখের ভাব দেখে মনে হল—ওরা কিছুই জানে না!

খানাতল্লাসী শুরু হতে দেখা গেল, প্রতি ঘরে সম্রাটের ছবি শোভা পাচ্ছে। কোনো কোনো ফটোর গায়ে ফুলের মালা দুলছে। **'England's Work in India'** থেকে তর্জমা করে নানা বাণী ঝোলানো রয়েছে দেয়ালের গায়ে। ভাইস্‌রয়দের ফটোর নীচে রাজভক্তির চমৎকার নিদর্শন! বৃটিশের পতাকাও খুঁজে পাওয়া গেল কোনো পড়ার টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে!

যে অফিসারের ওপর খানাতল্লাসীর ভার ছিল তিনি স্থানীয় থানার কর্মচারীকে ভৎর্সনা করে বললেন, 'কি খবরাখবর রাখেন আপনারা ? এই রকম এক রাজভক্ত বোর্ডিং সম্পর্কে আপনি আমায় ভুল খবর পাঠিয়েছেন ! আপনার বিরুদ্ধে আমি হেড-কোয়ার্টারে রিপোর্ট করবো ।'

গট্‌গট্ করে অফিসার বেরিয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে গেল তাঁর বিরাট বাহিনী।

তারপরেই ছেলেদের আনন্দের আতিশয্যে এত ক্ষিদে পেয়ে গেল যে, বোর্ডিং-এর বামুন সঙ্গে সঙ্গে খিচুড়ি আর মাংস উনুনে চাপিয়ে দিলে।

———